অজ্ঞাতবাস

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

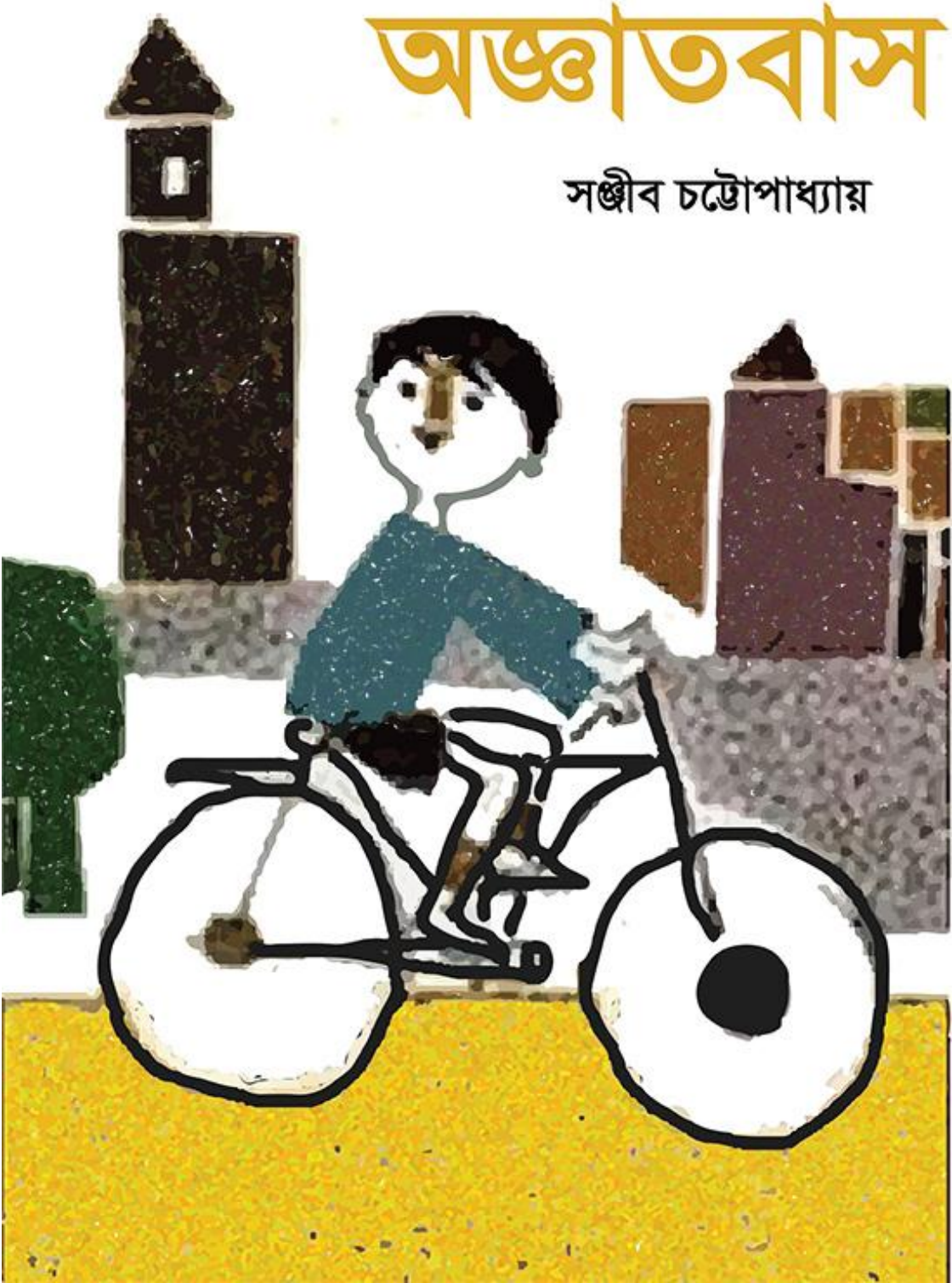

অজ্ঞাতবাস

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

eBook Created By: **Sisir Suvro**

Find More Books!

Gooo...

www.shishukishor.org

www.amarboi.com

www.banglaepub.com

www.boierhut.com/group

বড়মামা চিঠিটা তিনবার পড়লেন। যতবার পড়ছেন ততবারই মুখের চেহারা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। শেষবার পড়ে যখন আমার দিকে তাকালেন, তখন মুখ একেবারে উজ্জ্বলতম। আমি এখন পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে সংস্কৃত শিখছি। হাফইয়ারলি পরীক্ষায় সংস্কৃতে আমি মাত্র তিরিশ নম্বর পেয়ে কেঁদেকক্কে পাশ করায়, বড়মামা পুরো তিনটে দিন আমার সঙ্গে কথা বলেননি। মেজমামাকে বলেছিলেন, আমাদের হল গিয়ে পণ্ডিতের বংশ। আমার জ্যাঠামশাই ছিলেন বিখ্যাত তর্কচঞ্চু। মোচ্ছবতলায় নবদ্বীপের তর্কচূড়ামণিকে পরাজিত করে কৃষ্ণনগরের মহারাজের কাছ থেকে এই উপাধি পেয়েছিলেন। সেই বংশের কুলাঙ্গার হল এই কুষ্মাণ্ডটি। ইনি হলেন বাক্যচূড়ামণি। সকালে ওর মুখদর্শনে শরীরে পাপ সঞ্জাত হয়। গাত্রদাহ উপস্থিত হয়।

মেজমামা বললেন, দাদা, তোমার হলটা কী? পটাপট শুদ্ধ বাংলা বেরোচ্ছে। তোমার মুখে তো চিরকাল শুনে এলুম ধুর ব্যাটা, ধ্যার ব্যাটা, রামছাগল, ধেড়ে ইদুর, পটকে দে, লটকে দে। মনে হচ্ছে, তোমার নবজন্ম হল।

বড়মামা বলেছিলেন, “আমার ওপর পূর্বপুরুষের আবেশ হয়েছে। আজকাল মাঝে মাঝে আমার এইরকম হচ্ছে।

তাই তুমি উলটোপালটা বকছ ভুল বলছ। ইতিহাসকে বিকৃত করছ তর্কচঞ্চু আমাদের জ্যাঠামশাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন পাক্কা সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার। সাতবার বিলেত গিয়েছিলেন। বাংলা ভুলে গিয়েছিলেন। বাঙালিকে বলতেন কাওয়ার্ড। বোম্বেতে চাকরি করতেন। ঘোড়ায় চড়তেন। গলফ খেলতেন। জ্যাঠাইমাকে গাউন পরিয়ে ঘোড়ায় চাপা শেখাতে গিয়ে আছাড় খাইয়ে ঠ্যাং ভেঙে

দিয়েছিলেন। তর্কচঞ্চু ছিলেন, আমাদের বাবার বাবা। আচ্ছা, ডাক্তার হলে কি এমন অজ্ঞ হতে হয়! নিজের পরিবারের ইতিহাসটুকু জানো না!

বড়মামা বলেছিলেন, একটা সুযোগ পেয়েছ, এখন বলে নাও। তবে তোমার ভাষা আমি দু'জায়গায় সংশোধন করব। বাবার বাবা নয় প্রপিতামহ।

মেজমামা হইহই করে হেসে উঠলেন, প্রপিতামহ নয় পিতামহ। শোনো, অর্ডারটা হল এইরকম, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ। ক'পুরুষ হল? চার পুরুষ। ব্যস, আর ওপরে ওঠার দরকার নেই।

বড়মামা বললেন, অত বক্তৃতা দেবার দরকার নেই। একে বলে, স্লিপ অব টাঙ্গ। জিহ্বাস্থলন। আমি রোজ পিতৃপুরুষের তর্পণ করি। তোমার কী মনে হয়, এই ওপরে ওঠাটা আমি জানি না? বালক ! শোনো, আমি এইভাবে মনে রাখি, পি, প্রপি, বৃপ্রপি।"

হল না, একটা বাদ চলে গেল। ওটা হবে, পি, পিপি, প্রপি, বৃপ্রপি।

কী পিপি করছিস? একি মোটরগাড়ি নাকি? শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রভূত অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। যে কারণে তুমি অনায়াসে, অক্লেশে বলতে পারলে, জ্যাঠাইমার ঠ্যাং। তুমি শিক্ষিত, অধ্যাপক, তোমার মুখ থেকে এ আমি আশা করিনি। তুমি মুরগির ঠ্যাং বলো, সংশোধন করব না, জ্যাঠাইমার ঠ্যাং বললেই প্রতিবাদ করব। তুমি বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ, তোমাকে দেখে ছোটরা শিখবে, তুমি এখানে বসে বসে ঠ্যাং নাচাচ্ছ, আর বলছ, জ্যাঠাইমার ঠ্যাং। ছিঃ, ছিঃ। একে আমি বলতে পারি, তোমার অধঃপতন।

তুমি যে ঠ্যাং বললে?

কখন বললুম?

এই তো বললে, বসে বসে ঠ্যাং নাচাচ্ছ। জ্যাঠাইমার ঠ্যাংও বলেছ।

তোমার ঠ্যাংকে ঠ্যাং বলব না তো কি শ্রীচরণ বলব। তুমি কী আশা করো, আমার কাছ থেকে?

পুরু আলেকজান্ডারকে যেমন বলেছিলেন, ভদ্রলোকের প্রতি ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার।

বড়মামা বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ। এখন সমস্ত বিভেদ ভুলে ঐক্যমত হয়ে...।

হল না বড়দা। চেষ্টা করছ বটে, হচ্ছে না। য'ফলা সরাও তিন ঘর। ঐকমত্য বলো।

ঠিক ওই সময় মাসিমা ঘরে ঢুকে বললেন, তখন থেকে ওঘরে কাজ করতে করতে শুনছি, তিন ঘর সরাও, য'ফলা দুঘর সরাও, আর কাগের ঠ্যাং, বগের ঠ্যাং, মুরগির ঠ্যাং, এদিকে সকাল নটা বাজতে চলল, আজ কার বাজার করার পালা শুনি? কে আজ বাজার করে আমাকে উদ্ধার করবে!

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বিশাল একটা দেওয়াল ক্যালেন্ডারের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঠিক যতটা উৎসাহ নিয়ে গেলেন, ঠিক ততটা নিরুৎসাহ হয়ে ফিরে এলেন। মাসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ আমার পালা, কিন্তু আজ আমার ভীষণ রুগির চাপ। আমি যেতে পারছি না। আমি নাতিশয় দুঃখিত।

মেজমামা বললেন, এঃ, অকারণে একটা 'না' যোগ করে মানেটাই পালটে দিলে। না অতিশয়, নাতিশয় মানে তুমি আদৌ দুঃখিত নও। তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ! অতিশয় দুঃখিত, ভেরি সরি, তাই তো?

মাসিমা বললেন, ও সব সরি ফরি ছাড়ো। রুগির সঙ্গে তোমার কত যে সম্পর্ক আমার জানা আছে। আজ তিনমাস হল, তোমার স্টেথিস্কোপ ঘরের

দেওয়ালে ঝুলছে। যার যেদিন পালা সে সেদিন যাবে। আমার কড়া আইন। এই নিয়ে পরে ভাইয়ে ভাইয়ে চুলোচুলি হবে, তা আমি চাই না। আমি বিশ্বশান্তি চাই না, আমি চাই গৃহশান্তি।

মেজমামা বললেন, আইন ইজ আইন।

বড়মামা ভেংচি কাটলেন। আইন ইজ আইন! আমার জজসায়েব এলেন।

মাসিমাকে বললেন, বাজার যেতে হবে তো আগে বলিসনি কেন?

আমি বলব? কেন তোমার একটা দায়িত্ব নেই! রোজ খেচকে খেচকে আমাকে সব বাজার পাঠাতে হবে!

বড়মামা চারটে বড় বড় ব্যাগ হাতে বাজারে ছোটার জন্যে তৈরি হলেন। মেজমামা বড়মামাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, আমি এখন আরাম করে এককাপ চা খাব, খবরের কাগজের পাতা ওলটাব, এডিটোরিয়ালটা মন দিয়ে পড়ব। তারপর টুক করে দাড়িটা কামিয়ে, গায়ে আচ্ছা করে ম্যাসেজ অয়েল মেখে চান। তেল আজ মাখতেই হবে। স্কিনটা খসখসে হয়ে যাচ্ছে। আমার আবার তেল মাখার ক্যালেন্ডার আছে। তারপর শরীরে হালকা করে পাউডার ছড়িয়ে সাদা পাজামা আর-একটা টাওয়েল গেঞ্জি চড়িয়ে দোতলার দক্ষিণের ঘরে লম্বা বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে ভারী কিছু পড়ব না, পড়ব টিনটিন ইন আমেরিকা। তারপর যদি ছোট্ট একটা ঘুম এসে যায় তো যাবে। লাইট ন্যাপ।

বড়মামা মাসিমার হাত থেকে বাজারের টাকা নিতে নিতে বললেন, শুনেছিস। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কীরকম বলছে! রসিয়ে রসিয়ে। তারিয়ে তারিয়ে।

বলছে বলুক। ওর মুখ আছে বলছে।

আমার কান আছে ঢুকছে।

ঢুকুক।

আমার মনোবল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে।

তুমি এ-কান দিয়ে ঢুকিয়ে ও-কান দিয়ে বের করে দাও। ভগবান তোমাকে দুটো কান কী জন্যে দিয়েছেন?

মেজমামা যেন নিজের মনেই বললেন, ও হ্যাঁ ভুলেই গেছি, চান করে উঠে কিছু একটা খাওয়া দরকার, তা না হলে পিত্তি পড়বে। চারটে নরমপাক সন্দেশ বেশ বড় সাইজের, একমুঠো কাজু আর-একটু ফুটজুস খাব। কে জানে বাবা, কখন বাজার হবে, কখন রান্না হবে! নিজের পেট নিজেকেই ঠান্ডা রাখতে হবে। যস্মিন দেশে যদাচার।

মাসিমা বললেন, এইসব কথা তুমি কাকে শোনাচ্ছ?

নিজেকে। নিজের কর্মপরিকল্পনা নিজেকে শোনাচ্ছি।

তোমার কর্মপরিকল্পনার বারোটা আমি বাজাচ্ছি। আজ তোমার নর্দমা আর বাথরুম পরিষ্কারের ডেট। তুমি খুব মজা করে ভুলে গেলেও আমি ভুলিনি। কাল আমি অ্যাসিড আর নতুন ব্রাশ আনিয়ে রেখেছি। যাও, লেগে পড়ো।

আমার লো-প্রেশার হয়েছে। পরিশ্রমের সব কাজ বারণ। ডাক্তারবাবু বলেছেন, ভাল ভাল খাবে, গান শুনবে, মজার মজার বই পড়বে আর নেহাত প্রয়োজন না হলে বিছানা ছেড়ে উঠবে না।

বড়মামা দরজার কাছ থেকে বললেন, না, আমি বলিনি।

মেজমামা বললেন, তুমি ছাড়া ডাক্তার নেই নাকি? তুমি হলে হাইপ্রেশারের ডাক্তার। আমি লো-প্রেশারের ডাক্তার দেখিয়েছি।

ডাক্তারের আবার লো-হাই আছে নাকি?

অবশ্যই আছে। এ হল গিয়ে তোমার স্পেশ্যালিস্টের যুগ।

তা হলে আমাকে প্রেশার-মাপা যন্ত্রটা বের করতে হচ্ছে। বাজারে যাবার আগে ওই কাজটাই করি।

মাসিমা বললেন, দাদা, তুমি আর বিলম্ব কোরো না। আমার হঠাৎ মনে পড়ল, তুমি আজ শরৎবাবুকে নিমন্ত্রণ করেছ?

সকালে আমার মামার বাড়িতে যত গোলমালই হোক, রাতের দিকে সব ঠান্ডা। আর গোলমাল মানে কী, সবই তো মজার ব্যাপার। ঘরে ঘরে আলো। আমার মাসিমা বলেন, উঠক ইলেকট্রিক বিল, নেভার মাইন্ড, কোনও ঘর অন্ধকারে রাখা চলবে না। মা লক্ষ্মী কখন কোন ঘরে এসে বসতে চাইবেন, কে বলতে পারে। রাতে দূর থেকে আমার মামার বাড়িটাকে দেখলে মনে হয় স্বপনপুরী। চারপাশ ফাঁকা। সারি সারি গাছ দিয়ে ঘেরা বিশাল একটা তিনতলা বাড়ি। রংবেরঙের কাচের ভেতর দিয়ে আলোর রামধনু বেরিয়ে আসছে। সেকালের জমিদার বাড়ি। শুনেছি, আমি জন্মাবার আগে, অবস্থা খুব খারাপ হয়ে এসেছিল। এদিক ভেঙে পড়ছে, ওদিক ভেঙে পড়ছে। একবার ছোটমতো একটা ভূমিকম্প হল। চণ্ডীমণ্ডপ, আর উত্তর দিকটা ভেঙে স্তূপমতো হয়ে গেল। ভাঙা বাড়ির ফাক-ফোকর থেকে শেয়াল বেরিয়ে এসে প্রহরে প্রহরে ডেকে যেত। সেইসময় আমার বড়মামা—তিনতলার ভাঙা ঠাকুরঘরে নারায়ণের সামনে বসে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আমি যদি তোমার বাচ্চা হই, তা হলে এই ধ্বংসস্তূপ ঠেলে আমি উঠবই উঠব, উঠব, উঠব। তোমার ডান হাত আমার মাথায় রাখো। আমি যদি বাঘের বাচ্চা হই, তোমাকে আমি সোনার মুকুট পরাব, হিরে সেট করা।

আর যদি শেয়াল হই তা হলে ভৈরবীর ত্রিশূলের খোচায় বুক ফেড়ে মরে যাব। মই নেম ইজ সুধাংশু মুকুজ্যে।

বড়মামা যখন নারায়ণের সঙ্গে এইসব কথা বলছেন, তখন একটা নতুন মোটরগাড়ি শাঁ-শাঁ করে এগিয়ে আসছে এই বাড়ির দিকে। গাড়ি চালাচ্ছেন সায়েবের মতো এক বাঙালি। পরনে কালো সুট। সাদা সিল্কের জামার ওপর কালো টাই। ঠোটে বাকা করে ধরা পাইপ। বড়মামা এসবের কিছুই জানতে পারছেন না। তিনি নারায়ণের সঙ্গে রাগারগি করছেন। এদিকে নারায়ণের ইচ্ছায় একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটে চলেছে। ওইজন্যেই ভগবানের ওপর মানুষের এত বিশ্বাস বেড়ে যায়। একটা সাদা গাড়ি আসছে শাঁই শাঁই করে আসছে, আর বড়মামা যে ভাঙা ঘরে বসে আছেন তার তলার কড়ি-বরগা থেকে চুনচুন করে চুনবালি খসে খসে পড়ছে। নারায়ণ হাসছেন, বড়মামা রেগে রেগে যা-তা বলছেন। আমি এখন বড়মামা বলছি বটে, বড়মামা তখন ছোট, আর মামাই হননি। কী করে হবেন! আমি না হলে, বড়মামা বড়মামা হবেন কী করে! আমার ওপর রেগে গেলে, আমি তো সেই কথাটাই বলি। মনে করিয়ে দিই।

এখন হল কী, সাদা গাড়িটা বাড়ির সামনের মাঠে ঢুকল, আর তিনতলার ঠাকুরঘরটা ঝুপ করে ভেঙে পড়ে গেল দোতলার ঘরে। নারায়ণ, নারায়ণের বেদি, বড়মামা, পুজোর ঘট, কাঁসর ঘণ্টা সব জড়ামড়ি করে, তালগোল পাকিয়ে দোতলার শোবার ঘরের খাটের ওপর। হুম্মাড়, হুম্মাড় শব্দ শুনে যিনি যেখানে ছিলেন সবাই ছুটে এলেন। ধুলোয় চারপাশ অন্ধকার। ইট, টালি, পলস্তারা, কাঠকুটো। দরজা ঠেলে খোলা যায় না এমন অবস্থা। সাহসী যারা তাঁরা ঠেলেঠলে, টপকে-টাপকে ভেতরে দেখেন কী, ফটফট করছে রোদ। খাটের ওপর আমার

বড়মামা চিত। এমনভাবে ঠাকুর তাকে ফেলেছেন, যেন মাপ করে, তাগ করে। মাথাটা বালিশে, পা দুটো তাকিয়ার ওপর, আর নারায়ণ তার বুকের ওপর উপুড় হয়ে যেন চার হাত দিয়ে বড়মামাকে জড়িয়ে ধরে রক্ষা করছেন। সকলে বড়মামাকে তুলবেন কী, হা হয়ে গেলেন। সবাই সমবেত কণ্ঠে গাইতে লাগলেন, 'জয় নারায়ণ পরম কারণ। নারায়ণ-নারায়ণ ধ্বনি মিলিয়ে যেতেই অনেকে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, একটা ছবি তোলাবার ব্যবস্থা করো, করুণাময়ের এই করুণা ধরে রাখো, ধরে রাখো। খবরের কাগজের লোককে খবর পাঠাও।

বড়মামা ওঠার চেষ্টা করতেই সবাই হাঁহাঁ করে উঠলেন, উঠো না, উঠো না, আমরা না বলা পর্যন্ত উঠো না।

আর ঠিক সেই সময় ফস করে একটা আলো চমকে উঠল। সবাই ফিরে তাকালেন। দরজার সামনে ইটের স্তুপের ওপর এক সায়েব। বুকের কাছে ক্যামেরা ঝুলছে। তিনি আদেশ করলেন, গেট আপ সুধাংশু, আমাকে তুমি চিনবে না। আই অ্যাম ইয়োর জ্যাঠামশাই। লং টুয়েলভ ইয়ার্স পরে গ্লাসগো থেকে পরশু ফিরেছি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সবাই চিৎকার করে উঠলেন, প্রভু, প্রভু। কৃপা, কৃপা।

সেই ধ্বংসস্তুপ থেকে বড়মামাকে সেই বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার জ্যাঠামশাই টেনে তুললেন। আর সেই যে তুললেন, বড়মামা ক্রমশই উঠতে লাগলেন, ওপরে আরও ওপরে, আরও আরও ওপরে। জ্যাঠামশাই বালিগঞ্জে বাংলো কিনলেন। এই বাড়িতে তাঁর যে অংশটুকু ছিল, বড়মামাকে লিখে দিলেন। দাসপাড়ায় বিশাল একটা ঝিল ছিল আমার মামাদের। সেটার নামই হয়ে গিয়েছিল, আত্মহত্যার ঝিল। কারও সঙ্গে কারও ঝগড়া হলেই যার বেশি অভিমান

হত, এই ঝিলে এসে ঝুপুং করে ঝাপিয়ে পড়ত। তারপর খোঁজ খোঁজ। কী যে সব বলত লোকে ! বলত, এই ঝিলের তলায়, তোমরা জানো না ভাই, সাংঘাতিক সব কাণ্ড হয়ে আছে। বড় বড় চেন দিয়ে মোহর-ভরতি ঘড়া বাঁধা আছে। ঝিলের তলায় বড় বড় সাত-আটটা কুয়ো আছে। যক্ষের কুয়ো। ঝিলে একবার বাপ মারলে তার আর উঠে আসার উপায় নেই। পা ধরে টেনে ওই কুয়োর মধ্যে নামিয়ে নিয়ে যায়। কেউ বলত ঝিলের তলায় গোটা একটা মন্দির আছে। সেই মন্দিরে মা কাত্যায়নীর সোনার মূর্তি আছে। অনেক রাতে আকাশপথে হিমালয় থেকে উড়ে আসেন এক সন্ন্যাসী। তাঁর গা দিয়ে সোনালি জ্যোতি বেরোয়। তিনি ঝিলের ধারে এসে দাড়ালেই সব গাছ নুয়ে পড়ে। জল সরে গিয়ে দু'ভাগ হয়ে যায়। বেরিয়ে পড়ে ধাপ ধাপ সিড়ি। সন্ন্যাসী নেমে যান সেই সিঁড়ি ধরে। নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জল আবার সরে আসে। মন্দিরে শুরু হয় পূজারতি। একটা আলোর রেখা উঠে আসে নীচ থেকে ওপরে। মাঝখানে ভেসে ওঠে আলোর বিন্দু। একটা নয় অনেক। ঝিলের জল মন্ত্র পড়তে শুরু করে। সকালে সবাই এসে দেখতে পায় রাশি রাশি ফুল ভাসছে ঝিলের মাঝখানে। রাতে মরে গেলেও সেই ঝিলের ধারে কেউ যেত না। অশরীরীর ভয়ে। যারাই দুঃসাহস দেখিয়ে গেছে, তারাই পরের দিন পাগল। সেই পাগলদের লোকে বলত, ঝিল-পাগলা। তারা সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াত আর বলত, 'হায় হায়, কী দেখলুম! হায় হায়, কী দেখলুম!' আমরা দিনের বেলায় সেই ঝিল দেখেছি। উঃ, কী সুন্দর। কালো মিশমিশে জলে ঝিরিঝিরি ঢেউয়ের কোচ। যেন রুপোর টুকরো খেলছে। চারপাশে বড় বড় গাছ। ঝুসকুস শব্দ। ডালের আড়ালে-আবডালে কাটুম-কুটুম পাখির ডাক। টিরর টিরর পোকার শব্দ। জায়গাটা একেবারে নির্জন, শীতল।

গাছের মাথায় মাথায় রোদ, তলায় ঘন ছায়া। ঝিলের জলের ধারে ধারে পানিফলের চাষ। ফুটে আছে শালুক আর পদ্ম। কে কবে একটা নৌকো ভাসিয়েছিল, কোন সালে তা কে জানে। সেই নৌকোটা তখন আর ঘাটে বাধা ছিল না। ছাড়া ছিল। ভেসে বেড়াচ্ছিল, আপন মনে বাতাসে। কেমন মজা। কেউ কোথাও নেই, বিশাল ঝিলে রং চটা একটা ভুতুড়ে নৌকো কখনও এই ঘাটে, কখনও ওই ঘাটে, কখনও মাঝখানে গোল হয়ে ঘুরছে। আমাদের কোনও ভয় করছিল না। ভূতের না, চোর ডাকাতের না। কেবল মনে হচ্ছিল, যদি একটা অজগর বেরোয়। যদি বেরিয়ে আসে একটা গুলবাঘ। আমরা কালীদার সঙ্গে ঝিলে যেতম। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর। বিশেষ করে শীতকালে। ওখানে যেন আরও শীত ছিল। বর্ষাকালে কালীদা কোমর জলে নেমে ঝোপাঝোপা পানিফল তুলে আনতেন। আমি জিজ্ঞেস করতুম, 'এই যে জলে নামলেন, কই আপনাকে তো পা ধরে টেনে নিয়ে গেল না!' কালীদা বলতেন, 'সব সময় টানার চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমি যে মাকালীর মন্ত্র পড়ছিলুম, হুড়হুড় করে। মন্ত্রে মন্ত্রে কোনও ফাঁক রাখিনি। ভেতর থেকে একেবারে শিকলের মতো বের করছিলুম টেনে টেনে। তবে তোমাকে বলে রাখি, এই ঝিলটা খুব সহজ জায়গা নয়। অনেক রাতে তুমি কান খাড়া রাখলে শুনতে পাবে, টং টং, ঠং ঠং শব্দ। ঘড়া আর চেনে ঠোকাঠুকি।

বড়মামার জ্যাঠামশাই ঝিলটাকে বিক্রির চেষ্টা করেছিলেন। বিক্রির টাকায় ভেবেছিলেন, বাড়িটাকে সারিয়ে দেবেন। না সারালে, ক্লাইভের আমলের তিনতলা প্রাসাদ একদিন পুরোটাই ভেঙে পড়ে যাবে। ঝিলটা কেউ কিনতেই চাইল না। ভয়ে! তা ছাড়া ঝিল কিনে করবেটা কী। মাছের চাষ ! পাগল! ঝিলে

প্রচুর মাছ এমনিই আছে। সেসব মাছ হল দেবীর মাছ। আমার মায়ের কাছে গল্প শুনেছি, ওইসব মাছের নাম ছিল। তীরে দাঁড়িয়ে নাম ধরে ডাকলে, মাছ ছুটে আসত। "মোহন এসো, এসো।" জলে অমনি ঝাঁঝাঁ শব্দ। মোহন খপাং করে পায়ের কাছে মুখ তুলল। তার নাকে অমনি একটা সোনার নোলক পরিয়ে দেওয়া হল।

ঝিল যখন বিক্রি হল না, তখন ভয় তাড়াবার জন্যে সায়েবমানুষ জ্যাঠামশাই খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে সকলকে জানান দিয়ে মাছ ধরতে বসলেন। যত সব কুস!স্কার। গ্রামবাসী তোমরা দেখে যাও, আমি মাছ ধরব, সেই মাছ কেটে ফ্রাই করে, মাস্টার্ড দিয়ে খাব, তোমাদের খাওয়াব।

মাথায় শোলার টুপি। সাদা হাফ প্যান্ট, সাদা স্পোর্টস গেঞ্জি। বড়মামার জ্যাঠামশাই মাছ ধরতে বসেছেন। বিলিতি ছিপ। বিলিতি হুইল। বিলিতি সুতো। আড়ালে-আবডালে মানুষের ভিড়। ভীষণ উৎকণ্ঠা। অবিশ্বাসী মানুষটির কী হয় কে জানে! মাছ শুধু ধরা নয়। ভেজে খাওয়া। কালীদা ছিলেন পাশে। চার, টোপ এইসব ঠিকঠাক করে দিচ্ছেন। বিশাল ফ্লাস্কে চা। জ্যাঠামশাই বিলেত থেকে ব্রেড বক্স এনেছিলেন। তাইতে একশোটা স্যান্ডউইচ। জ্যাঠামশাই ছিপ ফেলতে যাচ্ছেন, ঠিক তখনই কে যেন 'ওহাহা করে হেসে উঠল। "কে হাসে?" জ্যাঠামশাই ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। বড় বড় চোখে তাকালেন চারদিকে।

কালীদা বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা, মানুষে হাসেনি সার। হেসেছে পাখি। এই পাখির নাম—উকো পাখি।"

আই সি। জ্যাঠামশাই সন্তুষ্ট হলেন। 'ইফ ইট ইজ এ পাখি, আই হ্যাভ নাথিং টু সে।'

বড়মামার জ্যাঠামশাই বাংলাটা তেমন বলতে পারতেন না। বাংলায় চলতে চলতে হঠাৎ হঠাৎ ইংরেজিতে হোঁচট খেতেন। ভাত, ডাল দেখলে চোখ ফেটে জল আসত। ফিশ অ্যান্ড চিপস, ক্লাব স্যান্ডউইচ, ফ্রিশ ফ্রাই, কাটলেট, এইসবই ছিল তার খাদ্য। যাই হোক, জ্যাঠামশাই মাথার ওপর ছিপটাকে কায়দা করে ঘুরিয়ে জলে সুতো ফেললেন। এবার সেই উকো পাখিটা খকখক করে কেশে উঠল। জ্যাঠামশাই পাখিটাকে ঠিক সহ্য করতে পারছিলেন না। কিন্তু কী করবেন। শুধু বলে উঠলেন, মোস্ট ডিস্টার্বিং।

পাঁচটা মিনিটও অপেক্ষা করতে হল না। মাছ গেঁথে গেল। কাইকাই শব্দ করে ভীষণ বেগে হুইল ঘুরতে লাগল। জ্যাঠামশাইয়ের চিৎকার, "ক্যাচ, ক্যাচ।" সারা ঝিল একেবারে তোলপাড়। এ তো মাছ নয়, যেন বাছুর গেঁথেছে ছিপে। সাবমেরিনের মতো খেলে বেড়াচ্ছে জলের তলায়। মাঝে মাঝে ডিগবাজি খাচ্ছে, তখন মাছের লেজটা জেগে উঠছে জলের ওপর। যেন উড়োজাহাজের লেজ। সবাই বলতে লাগল, বাঘা-ভালকোর লড়াই। হুইলের সব সুতো শেষ। তখন জ্যাঠামশাই মাছটাকে গুটিয়ে নিজের হাতের মুঠোয় আনার চেষ্টা করতে লাগলেন। মাছ ধরার নাকি সেইটাই নিয়ম। জ্যাঠামশাই কিছুটা টানার পরেই মাছ লাগাল টান। জ্যাঠামশাই ছিপসমেত সড়ক করে চলে গেলেন জলে। ছিপটা ছেড়ে দিলেই পারতেন। বড়মামার জ্যাঠামশাই বড়মামার চেয়েও একগুয়ে, একরোখা মানুষ ছিলেন। কথায় কথায় বলতেন, "সারেন্ডার নট" মানে আত্মসমর্পণ কোরো না। একটু আগে তিনি মাছকে খেলাচ্ছিলেন, একটু পরে মাছই তাকে খেলাতে লাগল। হঠাৎ একসময় জ্যাঠামশাই তলিয়ে গেলেন জলের অতলে। ঝিলের মাঝখানে ফাতনার মতো ভাসতে লাগল তার শোলার টুপি।

জলে ভেসে উঠল কিছু বুড়বুড়ি। সবাই বলতে লাগল, “উদ্ধার করো উদ্ধার করো।” কে উদ্ধার করবে। কার সাহস আছে জলে নামার? তখন সকলে সমবেত কণ্ঠে গাইতে লাগল, “ভব সাগর, তারণ কারণ হে, গুরুদেব দয়া করো দীনজনে।”

হঠাৎ একসময় অনেকটা দূরে জ্যাঠামশাই ভূস করে ভেসে উঠলেন। হাতে ছিপও নেই, মাছও নেই। সাঁতার কেটে তীরে এসে একটা কথাই বললেন, “ডেনজারাস, ভেরি, ভেরি ডেনজারাস।” ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগলেন ঝিলের দিকে। গেঞ্জি ফালাফালা। মাছটা শরীরের এখানে-ওখানে আঁচড়ে দিয়েছে। একটু সামলে উঠে বললেন, “যা দেখে এলুম তলায়! মাথা ঘুরে গেছে আমার।”

কী দেখলেন? কী দেখলেন?

জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, আর-একবার না দেখলে আমি বলতে পারব না। অবিশ্বাস্য সব ব্যাপার হয়ে আছে।

ঝিল বিক্রি হবে না, এই সিদ্ধান্তই হল। বড়মামার বাড়ি তা হলে মেরামত হল কী করে। সেইটার তো মজা। সেইজন্যেই তো বড়মামার এত হাকডাক। এত খাতির। সবাই বড়মামাকে এত ভালবাসেন। সেই ছেলেবেলায় বড়মামার বাবা, মানে আমার দাদু স্বদেশি করতে গিয়ে পেঁচো দারোগার গুলি খেয়ে ক্যান্টনমেন্টের কাছে মারা গেছেন। দিদিমা মারা গেছেন ম্যালেরিয়ায়। কী মশা! কী মশা! সূর্য ডোবার পর মুখের ওপর চায়ের ছাকনি ধরে কথা না বললে, মুখে মশা ঢুকে চলে যেত টাগরায়। তখন কাশি আর কাশি। বড়মামার তখন কেউ নেই। ছোট ছোট ভাই-বোন। সেই অবস্থায় জ্যাঠামশাই এসে সবে খাট থেকে তুলেছেন। ঝিল বিক্রি হয়নি, হবে না। কোথায় টাকা, কোথায় টাকা! বাড়ি

মেরামত হবে কীভাবে! জ্যাঠামশাই প্ল্যানটা করে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছেন। বড়মামা মনখারাপ করে ঘুরছেন। নারায়ণকে খাটের ওপরেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিছানার ওপর পড়ার ফলে ঠাকুরেরও কিছু হয়নি, বেদিরও কিছু হয়নি। নারায়ণ খাটে, বড়মামা মেঝেতে। অনেক রাত। চিন্তায় চিন্তায় বড়মামার ঘুম আসছে না। চিন্তা তো হবেই। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাইবোনদের শুকনো মুখ দেখলে মনখারাপ হয়ে যায়। সকালে উঠে ছোটরা কত কী খায়! বড়মামা শুনতেন, ছোটবোন মেজভাইকে বলছে, "আয় ভাই, এইবার আমরা একটু জল খাই।" এইসব শুনলে বড়মামার বুক ফেটে যেত। রোজ রাতে শুয়ে শুয়ে প্ল্যান করতে হত, কাল সকালে কী হবে! ভগবানই বড়মামাকে ডাক্তারির লাইনে ঠেলেছিলেন। চণ্ডীমণ্ডপের ভাঙা সিন্দুক থেকে হাতে লেখা একটা পুঁথি পেয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল, নানারকমের টোটকা ওষুধের ফর্মুলা। বড়মামা সেই পুঁথি দেখে তৈরি করেছিলেন বাতের তেল আর দাঁতের যন্ত্রণার গুড়ো। ওষুধ দুটোর ডিম্যান্ড হচ্ছিল একটু একটু করে। বড়মামার কোনও লজ্জা, অহংকার ছিল না। বাজারের একপাশে দাঁড়িয়ে, মুখে কাগজের চোঙা লাগিয়ে খুব বক্তৃতা দিতেন। গলা ভাল ছিল, খানিক ভজন গান গাইতেন। তারপর তুলে ধরতেন ওষুধ দুটো। বাত আর দাঁত। সকলে বলাবলি করত, জমিদারের ছেলে। দেখো, দেখে শেখো। তা, বড়মামা শুয়ে শুয়ে পরের দিন সকালের বক্তৃতা তৈরি করতেন মনে মনে। দুশো রকমের নাকি বাত আছে। বাবা, পৃথিবীতে এত সব আছেও বটে। বড়মামা এখন যেমন বলেন, যত না মানুষ তার চেয়েও বেশি রোগ।

সেই রাতে বড়মামা মেঝেতে শুয়ে শুয়ে গেঁটে বাতের বক্তৃতা মকশো করছিলেন। গেঁটেবাতে মানুষের সব শেষ কী অবস্থা হতে পারে। বাঁশের মতো

গাট গাট শরীর। প্রত্যেকটা গাট জানান দেবে, আমি তোমার গাট। সব আঁট হয়ে এমন হয়ে যাবে তখন আর নড়তে চড়তে হবে না। শোয়াও যাবে না, বসাও যাবে না, দাঁড়ানোও যাবে না। তখন যে কী হবে, যার হবে, সেই বুঝবে। পিতার নাম কাগজে লিখে পকেটে ফেলে না রাখলে মনেই থাকবে না। বড়মামা এখনও যেমন, তখনও তেমনই ছিলেন। ভয় দেখাবার একখানি। শুয়ে শুয়ে এক বাজার লোককে গেটে বাতের ভয়ে যখন প্রায় অবশ করে ফেলেছেন, তখন খাটের ওপর কড়াং করে একটা আওয়াজ হল।

এইবার বড়মামার ভয় পাবার পালা। খাটের ওপর বসে আছেন নারায়ণ। তাঁর বেদির ওপর। আওয়াজটা খাটের ওপরেই হল। তখন তো ইলেকট্রিক ছিল না। বড়মামা উঠে বাতি জ্বালালেন। ভেবেছিলেন, তিরের ফলায় চিঠি গেঁথে ডাকাতরা হয়তো ছুড়েছে। সাবধান! কাল তোমাদের ডাকাতি হবে। বিনীত বিশু। ঠাকুরদার আমলে এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। ডাকাতরা ঠিক সময় এসেওছিল। সেই সময় ডাকাত আর বরযাত্রীদের সমান খাতির করতেন জমিদাররা। হালুইকররা এসে ভালমন্দ খাবার তৈরি করত। কচুরি, রাধাবল্লভী, জিলিপি, কচি ভেড়ার কাবাব। শরবত। মঘাইপান। যেসব জমিদারের অনেক পয়সা, তারা আবার বেনারস থেকে ওস্তাদ আনিয়ে কালোয়াতি গানের ব্যবস্থা করতেন। একদিকে ওস্তাদ আআ করছেন, আর একদিকে ডাকাতরা হাহা করছে। নায়েব গোমস্তারা পরিবেশন করছেন ছুটে ছুটে। জমিদারমশাই জরির লপেটা, কাচি ধুতি, গিলে পাঞ্জাবি পরে ঘোরাফেরা করছেন। তদ্বির-তদারকি করছেন। মেয়েরা সব গায়ে গয়না চাপিয়ে, মুখে জর্দাপান ঠুসে বসে আছেন চিকের আড়ালে। সিঁড়ির মুখে হাতে দোনলা বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন

জমিদারের বড় ছেলে ব্রিচেস পরে। খাওয়া শেষ হবার পর, জমিদারমশাই জনে জনে জিজ্ঞেস করছেন, খাওয়া প্রভূত পরিমাণে হল তো! সন্তুষ্ট তো!' ডাকাতদের মুখে কালো তেল-রং চারদিকে ঝাড়লণ্ঠন জ্বললেও, মশাল ছাড়া ডাকাতি হয় না। তাই মশাল জ্বলছে এদিকে ওদিকে। ডাকাতরা যখন বলছে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, যথেষ্ট খেয়েছি। এখন একটা চারপাই পেলেই গড়ায়ে পড়ি; কিন্তু আমাদের কর্তব্য বাকি আছে।' তখন তাদের মুলোর মতো সাদা সাদা দাঁতের সারি ফ্যাকফ্যাক করে উঠছে। এইসময় হেড-ডাকাত জিগির তুললেন, 'হা রে, রেরে। তারপর জমিদার মশাইয়ের গালে ঠুস করে এক চড় মারবে। সেইটাই ছিল নিয়ম। সঙ্গে সঙ্গে কুমারবাহাদুর আকাশের দিকে বন্দুক তুলে ব্লাম ব্লাম করে দু'বার ফায়ার করবেন। আর শুরু হয়ে যাবে মহা শোরগোল, দাপাদাপি। উঠোনে ডাকাতরা শুরু করবে ডাকাতে নৃত্য। কনসার্ট বাজতে থাকবে। মেয়েরা শাখে ফুঁ দেবে। ঘুমন্ত বাচ্চাদের টেনে তোলা হবে প্যাঁ প্যাঁ করে কাঁদার জন্যে। তারপর একসময় মশালচিরা একে-একে সব আলো নিবিয়ে দেবে। শুধু জ্বলতে থাকবে মশাল। আরও কিছুক্ষণ তাণ্ডব চলার পর ডাকাতরা দেখতে পাবে জমিদারমশাইয়ের রাখা পুটলিটা। যেই একটা বাঁশি বাজবে অমনি ডাকাতরা পুটলিটা তুলে নেবে, আর 'হে রে রে রে' করে বেরিয়ে আসবে জমিদারের লেঠেলরা। ঠকাস, ঠকাস করে তারা লাঠিতে লাঠি ঠুকতে থাকবে। উঠোন জুড়ে শুরু হয়ে যাবে তাদের লাঠি-নৃত্য। কুমারবাহাদুর এইসময় আবার দু'বার ফায়ার করবেন। ডাকাতরা তখন মাঠময়দান ভেঙে ছুটতে শুরু করবে। হেড ডাকাতের পায়ে রনপা। সে তখন অনেক দূরে; যেন একটা তালগাছ ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে তিরবেগে ছুটছে। লেঠেলরা নানারকম চিৎকার করতে করতে তাদের পেছন পেছন কিছুদূর ছুটে,

মাঠে বসে পড়বে, দু-দশটা বিড়ি খাবে। লাঠিতে আচ্ছা করে তেল মাখাবে। নিজেদের গোফে মাখাবে মৌচাকের মোম। তারপর 'জয় মা কালী, পাঠা বলি,' 'জয় মা কালী, পাঠা বলি, বলতে বলেতে ফিরে আসবে দেউড়িতে। রটে যাবে, অমুক জমিদারের বাড়িতে মস্ত এক ডাকাতি হয়ে গেছে। জমিদারের সম্মান বেড়ে যাবে। পরের দিন প্রজারা এসে পায়ের ধুলো নেবে। বাচ্চারা ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাবে আর ঝাড়লণ্ঠনের ভাঙা কাচ তুলে কোচড়ে ভরবে। যে যেমন পারবে জমিদারবাবুর পায়ের কাছে টাকার তোড়া রাখবে। রাখবে লাউ, কুমড়ো, মোচা, কাচকলা, বড় বড় রুইমাছ। জমিদারবাবু মিছিমিছি হাতে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে হাতটা ঝুলিয়ে রাখবেন গলা থেকে বুকের কাছে দিকে দিকে রটে যাবে, জমিদারবাবু একা লড়াই করে সাতটা ডাকাত ঘায়েল করেছেন। তাদের লাশ পায়ে পাথর বেঁধে ফেলে দেওয়া হয়েছে আত্মহত্যার ঝিলে। প্রজারা চলে যাবার পর আসবেন ভবতারিণী মন্দিরের পুরোহিত। জমিদারবাবুর কপালে লেবড়ে দেবেন মায়ের পায়ের সিঁদুর। যাবার সময় তার পেছন পেছন চলবে দড়িতে বাঁধা সাতটা নধর পাঁঠা। আগে আগে চলেছেন পুরোহিতমশাই, হাতে একটা পাতাসমেত বটের ডাল নাচাতে নাচাতে। পেছনে নাচতে নাচতে চলেছে সাতটা পাঠা, ব্যা ব্যা করে কালোয়াতি গান গাইতে গাইতে। একটু পরেই শুরু হবে বলি। জমিদারের কল্যাণে। ওঁ ক্রীং, খ্রীং, ঘ্রীং ঘ্যাচাং পুরোহিতমশাই নিজের জন্যে কিছুটা রেখে বাকি ঝুড়িটা পাঠিয়ে দেবেন জমিদারমশাইয়ের রান্নাঘরে। দুপুর থেকেই আসতে থাকবেন প্রতিবেশী জমিদাররা বীরত্বের খবর নিতে। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই বসে যাবে খানাপিনার আসর। পশ্চিমি ওস্তাদ গান ধরবেন আর পীড়নবাঈ নাচতে থাকবে ধিতিং ধাতাং ধিতিং।

ড়মামার তখন টর্চলাইট ছিল না। সাইকেল, মোটর কিছুই ছিল না। বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। মাথার কাছে একটা দেশলাই, একটা কুপি, একটা হাতপাখা, একটা ঝাটা আর-একটা লোহার রড নিয়ে শুতেন। কুপি জিনিসটা ভারী মজার। আমাকে একটা বড় মুখঅলা শিশি দিলে এখনই করে দেখাতে পারি। কালির দোয়াতে খুব সুন্দর হয়। ঢাকনায় একটা ফুটো করব। একটা সলতে পাকিয়ে চালিয়ে দেব তার মধ্যে দিয়ে। ভেতরে থাকবে কেরোসিন। হয়ে গেল কুপি। বড়মামা ছেলেবেলার সেই কুপিটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে সেটাকে বের করে বলতে থাকেন, 'মন ভুলে যেয়ো না, একসময় তোমার জীবনের আলো ছিল এই কুপি। আজ তোমার ফ্যান, ফোন ফ্রিজ হয়েছে বলে মেজর মতো অহংকারে মটমট কোরো না। সব উপদেশেই বড়মামা, মেজমামাকে টেনে আনবেন উদাহরণ হিসাবে। মাসিমা বলেন, 'একেই বলে পায়ের ওপর পা দিয়ে ঝগড়া করা।' বড়মামা ঝাঁটাটা রাখতেন ভূতের ভয়ে আর লোহার ডান্ডাটা রাখতেন সাপের ভয়ে। এখন রাতে খাওয়া দাওয়ার পর আমাদের যে গল্পের আসর বসে, সেই আসরে অতীত দিনের গল্প বলতে বলতে বড়মামা একটা কথা প্রায়ই বলেন, 'অর্থের চেয়ে অনর্থ আর দুটো নেই। তখন আমার দরজা ছিল না, জানলা ছিল না, মাথার ওপর আধভাঙা ছাদ, সিন্দুক নেই, স্টিল আলমারি নেই, কিছুই নেই, চোরডাকাতেরও ভয় নেই। মনের আনন্দে ঘুম। চারপাশ দিয়ে হুহু করে বাতাস ঢুকছে। বাতাস আবার দেওয়ালের ফুটোর মধ্যে দিয়ে আসার সময় বাঁশি বাজাত। এক-এক ফুটোর মধ্যে দিয়ে আসার সময় এক-এক সুর। সা-রে-গা-মা। চিত হয়ে শুয়ে আছি, ভাঙা ছাদে আটকে আছে আকাশের তালি। জ্বলজ্বলে তারা তাকিয়ে আছে আমার দিকে, শুক্লপক্ষে রাত

বারোটার সময় মেঘের রুমাল ওড়াতে ওড়াতে আমাকে দেখতে আসত চাঁদ—হ্যালো, সুধাংশু। আর আজ আমাদের কী অবস্থা। চোরের মতো। চারপাশে দশফুট উঁচু জেলখানার পাঁচিল। তার ওপর লোহার আল। বাড়িতে সাত-সাতটা কোলাপসিবল গেট। মাঝরাতে খুট করে কোথাও একটা শব্দ হলেই মেজ অমনি হেঁড়ে গলায় চিৎকার জুড়ে দিল, 'কে, কে, কৌন হ্যায়? এমন গর্দভ? ওর ধারণা চোর আর ডাকাতরা হিন্দি ছাড়া আর কোনও ভাষা বোঝে না। আর ঘরে খিল এঁটে, 'কৌন, কৌন' না করে বেরিয়ে আয়। বেরিয়ে এসে দেখ। ভিতু কোথাকার? আসলে তা নয়, বুঝলি তো কুসি, মানুষ যত বড়লোক হতে থাকে, ততই তার ভয় বেড়ে যায়। জীবনের ভয়, ধনসম্পত্তি হারাবার ভয়। অসুখের ভয়। অ্যাকসিডেন্টের ভয়।'

বড়মামার এই কথায় কিছুক্ষণের জন্যে বড়মামার ছেলেবেলার গল্প ভন্ডুল হয়ে যেত। মেজমামা বসেন একটা দোল-দোল চেয়ারে। সামনে পেছনে হালকা চালে দুলতে দুলতে গল্প শোনেন। পরনে সাদা ঢোলা পাজামা, পাঞ্জাবি। কোলের ওপর কালো ফ্রেমের চশমা। মেজমামার দোল দোল থেমে গেল। প্রতিবাদ করে উঠলেন, "কতবার তোমাকে বলেছি, বড়দা, আমি এখন বিশাল বড় হয়ে গেছি! আমাকে গর্দভ বোলো না। আমার মান-সম্মানে ভীষণ লাগে। ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা আমাকে সার বলে।"

বড়মামা আমনি তার হাঃ হাঃ হাসি দিয়ে মেজমামাকে ঠান্ডা করে দেবেন, আরে, গাধা এ-গর্ধভ তোর ধোপার গাধা, বোকা গাধা নয়, এ হল আমাদের ফ্যামিলির আদরের গাধা।

এরপরই আমার বড়মামার সেই এক কথা, বল তো কুসি, কী করে আবার সেই পুরনো দিনে ফিরে যাওয়া যায়!

মাসি অমনি বলবেন, আর তো সম্ভব হবে না বড়দা? তোমরা এখন পয়সার স্বাদ পেয়ে গেছ মানুষখেকো বাঘ কি আর আলোচালখেকো হতে পারে!

বড়মামা দুঃখ দুঃখ মুখে বলবেন, কী করে যে আবার গরিব হওয়া যায় কুসি?

মেজমামা অমনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবেন, কতদিন যে আমার খিদে পায়নি? সেই গরিবের খিদে! কী খাই, কী খাই করে সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মুড়ির টিনে মুড়ি নেই। ভাতের হাড়িতে ভাত নেই। কোথাও এক টুকরো শুকনো রুটি নেই। ক্ষুধার্ত বেড়ালের মতো এ-ঘরে, ও-ঘরে, সেঘরে। পেয়ারা গাছের ফুলকচি পেয়ারা ফাঁক। বাসনমাজার তেঁতুল, তাই, তাই সই। পাকা তেলাকুচো। সে কী খিদে। এখন খিদের আগেই খাবার, তার ওপর খাবার, খাবারের ওপর খাবার। আর পারছি না কুসি। কুসি তাও দিয়ে যাচ্ছে।

মেজমামা প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কী। বড়মামা অমনি বলবেন, দুঃখ করিসনি মেজ। কী আর করবি বল, যার যেমন বরাত ভাই? এই তো দেখ না, আমি কতদিন ভেলিগুড়ের গোদো চ্যাটচ্যাটে মুড়কি খেতে পাইনি। ছোলার পাটালি খাইনি। ছাতু খাইনি। ঠান্ডা ফুলুরি খেয়ে অম্বলে গেলাসের পর গেলাস জল খাইনি। অম্বল হলে জল খেতে কী ফ্যান্টা লাগে জানিস? কী করবি ভাই? সকালে তোকে চা খেতে হবেই। চা খালি পেটে খাওয়া যায় না। কুসি অ্যালাউ করবে না। দুটো পাউডার পাফ বিস্কুট তোকে খেতেই হবে।

মেজমামা সংশোধন করে দিলেন, পাউডার পাফ নয়, লেমন পাফ।

ওই হল? তারপর ব্রেকফাস্ট তো ভাই জল খেয়ে হয় না। যার যা নিয়ম! দুটো ডিম, হয় পোচ, না হয় ওমলেট? দুপিস টেস্ট। একটা কলা। কনফ্লেকস। থাকবেই থাকবে। কান্ট হেলপ। যে পুজোর যা উপচার। শুধু ব্রেকফাস্ট খেয়ে পৃথিবীর কেউ বাঁচতে পারে না; তা হলে লাঞ্চ শব্দটা এল কোথা থেকে। লাঞ্চে তোমার টেবল-রাইস, মাছ, মাংস, ভেজিটেবল। ডেসার্ট থাকবেই। কান্ট হেলপ। বিকেলে তোমাকে চা নিতেই হবে। সামান্য ম্যাকস। রাতে ডিনার। বলো, এর হাত থেকে বাচার কোনও পথ আছে? কে তোমাকে বাচাবে ভাই?

এই গল্পের আসরেই বড়মামা সেই ঠাকুরঘর ভেঙে নারায়ণ বুকে নিয়ে দোতলার ঘরে খাটের ওপর পড়ে যাবার গল্পটা যে কতবার বলেছেন আমাদের। বলে বলেও পুরনো হয়নি। যত শুনি ততই ভাল লাগে। মেজমামা বলেন, গাছে যেমন রোজ রোজ নতুন পাতা বেরোয়, বড়মামার গল্পের গাছেও সেইরকম রোজই নতুন নতুন গল্পের পাতা বেরোয়। এইটাই ইন্টারেস্টিং। সাতদিন আগে যা শুনেছি সাতদিন পরে তাইতে নতুন ফ্যাকড়া। ভদ্রলোক ডাক্তারি না করে কলম ধরলেও নাম করতে পারত।

মাঝরাতে কড়াং করে শব্দ। বড়মামা ভেবেছিলেন, তিরের ফলায় চিঠি ফুড়ে ডাকাতরা ঘরে ছুড়েছে। ঘুমের ঘোর কেটে যাবার পর মনে হল ধুস, রঘুডাকাত, বিশুডাকাতের যুগ কবে শেষ হয়ে গেছে। আর এই বাড়িতে ডাকাতি করার আছেটা কী। ভাঙা ইট, বালি, চুন, সুরকি? দেশলাই জ্বেলে মাথার কাছে রাখা কুপিটা জ্বাললেন। লোহার ডান্ডাটা হাতে নিলেন। বলা যায় না, সাপখোপ হতে পারে। কুপিটা তুলে ধরলেন খাটের দিকে। অবাক কাণ্ড, নারায়ণ ঠাকুরের পায়ের দিকের একটা অংশ খুলে পড়ে গেছে। আর সেই ফুটো গলে এক গাদা

গোল গোল সোনার চাকতির মতো কী বেরিয়ে এসে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে আছে। সব মোহর। সেই রাজার আমলের চাদির চাকতি। পরের দিন সকালে বড়মামার সায়েব জ্যাঠামশাই এসে বললেন, "ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে। আত্মহত্যার ঝিল বিক্রি হল না ভেবে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আর আমাদের পায় কে? আমার প্ল্যান রেডি, বোলাও মিস্ত্রি।

জ্যাঠামশাই বাড়িটার কিছু ঝরিয়ে, কিছু গড়িয়ে এমন একটা ব্যাপার করে দিলেন, দেখে সকলের তাক লেগে গেল। বাড়ি উঠল। বড়মামা উঠলেন। জ্যাঠামশাই বড়মামাকে ডাক্তার করে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বেরিয়ে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে। এই বাড়িতে, বসার ঘরে জ্যাঠামশাইয়ের বিশাল একটা তৈলচিত্র আছে। একেবারে পাক্কা সায়েব। মুখে পাইপ। পায়ের কাছে বাঘের মতো বিশাল একটা কুকুর। বড়মামা জ্যাঠামশাইকে ভীষণ শ্রদ্ধা করেন। তেমনি ভালবাসেন। গভীর রাতে শুতে যাবার আগে ছবিটার সামনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন স্থির হয়ে। তারপর মিলিটারি কায়দায় স্যালুট করে শুতে চলে যান। আমি আর বড়মামা একই ঘরে শুই। শুয়ে শুয়ে বড়মামা বলতে থাকেন, গাড়ি যেমন পেট্রোলে চলে, মানুষ তেমনি চলে আশীর্বাদে। পূর্বপুরুষরা আশীর্বাদ না করলে জীবনকে চালাতে হয় ঠেলে ঠেলে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার পূর্বপুরুষ আছে বড়মামা?

পূর্বপুরুষ ছাড়া মানুষ হয় বোকা। তোর পূর্বপুরুষ হলাম আমি। জলজ্যান্ত তোর পাশের খাটে শুয়ে আছি। তোর আরও পূর্বপুরুষ আছে, তবে একেবারে সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ হলুম আমি। আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করবি। আমি চলে যাবার পর আমার ছবিতে মালা দিবি।

আর আমাদের সর্বপ্রথম পূর্বপুরুষ হল বাঁদর। তাই তো?

সেটা তোর হতে পারে, আমার নয়। আমি স্ট্রেট একেবারে ভগবানের কাছ থেকে আসছি। আমার স্বভাব-চরিত্র দেখে তাই মনে হয় না কি? আমার কীরকম একটা ভাব আছে, তাই না। তুই বুঝতে পারিস না?

পারি তো। একেবারে খামখেয়ালি।

তাই তো ! ভগবান নিজেই তো খামখেয়ালি। কখন কী যে করে বসেন?

বড়মামা বাজার থেকে ফিরে এলেন প্রায় ঘণ্টাদুয়েক পরে। সে এক কাণ্ড! বড়মামা আসছেন আগে আগে, পেছন পেছন আসছে কীর্তনিয়ার দল। তা প্রায় সাত-আটজন হবে। আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। বারান্দায় দাড়াবার কারণ ছিল। অত দেরি হচ্ছে দেখে আমি আর মাসিমা চটি পায়ে দিয়ে রেডি হয়েছিলুম খুঁজতে বেরোবার জন্যে। মাসিমার আবার প্রেশারটা মাঝে মাঝে চড়ে যায়। বড়মামা আর মেজমামাই হাই প্রেশারের কারণ। মাসিমা একেবারে রেগে ফায়ার হয়েছিলেন। নিমন্ত্রিত একজন খাবেন। এ-বাড়িতে কাউকে খাওয়াতে হলে তাকে একেবারে খাইয়ে শেষ করে দেওয়া হয়। খেতে খেতে তিনি একসময় কেঁদে ফেলেন। হাতজোড় করে বলতে থাকেন, “বিশ্বাস করুন, আমি আর পারছি না। আমার পেটে আর জায়গা নেই! আমি পেট ফেটে মরে যাব।

বড়মামা অমনি বললেন, ছি ছি, কী অবৈজ্ঞানিক কথা। পেট আর বেলুন এক জিনিস। যত ফোলাবেন তত ফুলবে। পেট এমন এক বেলুন, যা ফাটে না। পেটটা একটু টাইট হবে। এই আর কী। আমার পিতামহ যখন আহারাদি শেষ করে উঠতেন, পরিমাণ মতো খাওয়া হল কি না পরীক্ষা করার জন্যে একটা

পদ্ধতি ছিল। পিতামহ যে খাটে শুতেন, সেই খাট আর মাথার দিকের দেওয়ালের মাঝে চারফুটের মতো একটা ফাঁক ছিল। আহারের পর সেই ফাঁক দিয়ে সহজে অনায়াসে গলে যেতে পারলে পরিমাণ ঠিক হয়নি। আর ভুড়ি আটকে গেলে পরিমাণ ঠিক হয়েছে। "নিন, নিন, আর তো মাত্র তিন চারটে আইটেম বাকি আছে। কৌটো ঝাঁকানোর মতো শরীরটা ঝাঁকিয়ে নিন।" বড়মামা একদিন আমাকে একটা গল্প বলেছিলেন, রোম যখন সভ্যতার একেবারে তুঙ্গে, সেই সময় রোমান রাজপুরুষদের খাওয়ার গল্প। বিশাল টেবিলে সব খেতে বসেছেন। প্রত্যেকের পায়ের কাছে একটা করে ঢাকা পাত্র। ক্রীতদাসরা পরিবেশন করছে। একের পর এক আইটেম আসছে। আসছে তো আসছেই। আর সে তোমার গিয়ে আমাদের মতো ভাত, ডাল, আলুভাতে নয়। মাছ, মাংস, দুম্বা, স্নপ, সস, গোরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর। ধপাধপ টেবিলে এসে পড়ছে। রোমক রাজপুরুষরা খেতে খেতে কাত হয়ে পড়ছেন। আর ঢাকাপাত্রের রহস্যটা হল, পেটে চাপ পড়ার ফলে অনেকেরই বেগ এসে যাচ্ছে। তারা পেটখালি করে আবার খাওয়া শুরু করছেন। কী অসভ্য কাণ্ড!

সেই বাড়ির নিমন্ত্রণে বড়মামা গেছেন বাজারে বাজার করতে। মিনিমাম সাঁইত্রিশ পদ রান্না তো হবেই। আর সেই বড়মামা বেপাত্তা। মাসিমা বারান্দায় পায়চারি করছিলেন আর বলছিলেন, "দুভাই দুটি অবতার! কাণ্ডজ্ঞান নেই, সময়জ্ঞান নেই। ইররেসপনসিবল।" আর ঠিক সেই মুহূর্তে বড়মামার আবির্ভাব। কীরকম আবির্ভাব? না নিমাই প্রভুর মতো? নদীয়ার পথ ধরে আসছেন কীর্তন লিড করে।

কীর্তনের দল তারস্বরে গাইছেন, “আমি প্রেমের ভিখারি, কে প্রেম বিলায় এই নদীয়ায়?” আর সে কী খোলবাদ্য? কলাপ কলাপ করে। আর কীর্তন এমন জিনিস না নেচে পারা যায় না। বড়মামা তো বড় ডাক্তার। চিকিৎসার পদ্ধতিও অদ্ভুত। কারও কোমরে বাত হলে প্রেসক্রিপশান করেন, হরিসভা। রোগী ওষুধের দোকান থেকে ফিরে আসে।

ডাক্তারবাবু প্রথম ওষুধটাই তো নেই? ওর বদলে একটা কিছু...।

ওর তো বদল হয় না ভাই। সকাল-সন্ধে হরিসভায় যাবে আর কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দু’হাত তুলে শরীর দুলিয়ে নাচবে। ফর লাইফ। বাকি জীবনটা এইভাবেই কাটাবে। বাতের বাপও তোমার কিছু করতে পারবে না।

বড়মামার ওই আগমন দেখে, মাসিমা বললেন, সেরেছে। এ দেখি বাজার থেকে কীর্তন কিনে নিয়ে এল? নাও, এইবার বোঝো ঠ্যালা? বাবুর হাতে তো খুঞ্জনি। ব্যাগফ্যাগ কিছুই তো নেই।

তাই তো?” বলেই দেখি, সব শেষে আসছে তিনজন বাকামুটেঅলা, “মাসিমা, ওই দেখো।” সবশেষে বাক কাঁধে একজন। তার বাকের একদিকে ছানা, আর একদিকে দইয়ের ভাড়। কীর্তনের দল বাগানে এসে ঢুকল। সেখানে ঘুরে ঘুরে নাচ হল। সঙ্গে গান, “যে যত চায়, সে তত পায়, আমি প্রেমের ভিখারি কে প্রেম বিলায় এই নদীয়ায়!”

খোল আর খঞ্জনির খচখাই শব্দ, সেই সঙ্গে দশজন পুরুষের সমবেত চিৎকার, মেজমামা ভুরু কুঁচকে মারমুখি হয়ে বেরিয়ে এলেন, “স্টপ স্টপ। না চেচালেও পয়সা পাবে। পয়সা পাবে।”

আমি জানি মেজমামার কীর্তনে অ্যালার্জি আছে। পাড়ায় অষ্টমপ্রহর হলে, মেজমামা বসিরহাটের বাগানবাড়িতে চলে যান। মেজমামা বলেন, “কীর্তনের কামড়ের চেয়ে, মশার কামড় ঢের ভাল।”

মেজমামার ধমক শুনে বড়মামা বারান্দার সামনে মাথা নিচু করে এসে দাঁড়ালেন। বৈষ্ণবরা যেমন করেন, মাথায় খঞ্জনি রেখে অবিকল সেইরকম গলায় বললেন, “জয় নিতাই।”

বড়মামাকে তো সহজে চেনা যাচ্ছে না। বাজার করার নরম সাদা থলিটাকে ভাজ ভাজ, পাট পাট করে টুপির মতো মাথায় পরেছেন। ঠিক মনে হচ্ছে ব্রহ্মচারী।

দুই

মাসিমা রেগে গেলে র্যান্ডাম ইংরিজি বলেন। কীর্তনিয়াদের দল থেকে বড়মামাকে আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন, “হোয়াট ইজ দিস? আই ওয়ান্ট টু নো হোয়াট ইজ দিস?”

বড়মামা মাসিমাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। প্রায় জোড়হাত করে। কীর্তনিয়ার দল খ্যাংখ্যাং করে খঞ্জনিতে বিকট শব্দ তুলে নীরব হলেন। মনে হল, এইমাত্র পৃথিবীর সবাই যেন একসঙ্গে মরে গেল। মেজমামা বললেন, “আঃ, কী শান্তি!” সত্যিই কী শান্তি! বাতাসের শব্দ, পাখির ডাক, এমনকী নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে।

কীর্তনদলের হেড বললেন, স্বরূপ দেখে মনে হচ্ছে আপনি এই বাড়ির মেজকর্তা। ঠিক বটে?

মেজমামা বললেন, ঠিক বটে।

আ, বড়কর্তা বলছিলেন, বিধর্মী। আপনার মনের পরিবর্তন করতে হবে। মাছ, মাংস আর ডিম্ব এই তিন ম্লেচ্ছ সংসর্গ থেকে উদ্ধার করতে হবে। তা করে দেব। কী আছে! প্রভুর কৃপায় সবই সম্ভব। চব্বিশ ঘণ্টা এই নাম শুনলে মিলিটারি সায়েবও রসকলি ধারণ করে ঘোর বৈষ্ণব হয়ে যাবে নামের এমন মাহাত্ম্য।

কথা শেষ করে তিনি ইশারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে খচাখাঁই, খচাঁখাই খোলকরতাল বেজে উঠল। আর সবাই নাচতে লাগলেন, “প্রেমদাতা নিতাই বলে, বোল হরি হরি বোল। প্রেমদাতা নিতাই বলে।” মেজমামাও নাচছেন, তবে অন্য

তালে। গানও গাইছেন, তবে অন্য গান, “চুপ চুপ। একদম চুপ। চুপ, চুপ, একদম চুপ।”

কে কার কথা শোনে। যারা কীর্তন করছেন, তাদের কানে কিছুই ঢুকছে না। ঢোকার উপায়ও নেই। ইতিমধ্যে বড়মামার আট জাতের আটটা কুকুর বেরিয়ে এসেছে। কুকুররা দেখছি কীর্তন একেবারে সহ্য করতে পারে না। তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করছে। শ্যামাসংগীত শুনলে এইরকম করে না কিন্তু। ঘাড় বাঁকিয়ে কান খাড়া করে, সমঝদার শ্রোতার মতো বেশ শোনে।

মেজমামাকেও থামানো যাচ্ছে না। তিনি “চুপ চুপ” করতে করতে শেষমেশ “চোপ, চোপ” বলতে শুরু করেছেন। অবশেষে চিৎকার, “পোলিশ, পোলিশ।” মেজমামা বেগে গেটের দিকে এগোতে এগোতে বললেন, “আমি থানায় চললাম। কোনও ভদ্রলোকের পক্ষে এই অত্যাচার সহ্য করা শক্ত। আমি একটা ডায়েরি করে আসি।” কিন্তু গেট পর্যন্ত যেতে পারলেন না। কীর্তনিয়ারা ঘিরে ধরল। মূল গায়েন মেজমামার ডান হাত ধরে ওপর দিকে তুলে নিজেও নাচছেন, আর মেজমামাকে নাচাচ্ছেন। সমানে গেয়ে চলেছেন, “হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।”

মাসিমার সঙ্গে কথা শেষ করে, বড়মামা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তার ভাব এসে গেছে। থেকে থেকে বলছেন, “হরি বোল। হরি হরি বোল। হরি হরি বোল।” এদিকে মেজমামা নাচের চোটে গলগল করে ঘামছেন। মেজমামা একটু সুখী মানুষ। বেশি পরিশ্রম তার সহ্য হয় না। ছোট একটা ভুড়ি আছে। পাঞ্জাবির তলায় সেইটাই বেশি নাচছে, থলথল, ধলধল করে। মেজমামা একসময়

থ্যাস করে পড়ে গেলেন। বড়মামা চিৎকার করে উঠলেন, “সমাধি, সমাধি হয়েছে, সমাধি। আমাদের বংশে এই প্রথম। ফাস্ট টাইম ইন আওয়ার ফ্যামিলি।”

মেজমামা আধবোজা চোখে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, “সমাধি নয়, সমাধি নয়, হার্ট অ্যাটাক করোনারি গ্রম্বোসিস।” বাঁকি আর ঝাঁকাঅলারা বললে, “আমাদের ছেড়ে দিন বড়বাবু।”

মাসিমাকে জিজ্ঞেস করলুম, এটা কী হচ্ছে মাসিমা? বড়মামা তো তারা তারা করতেন। আজ হঠাৎ হরি হরি!

মাসিমা যা বললেন, তা একমাত্র বড়মামার পক্ষেই করা সম্ভব। মাছের বাজারে ঢুকে দেখেন দর যাচ্ছে পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট। বড়মামার আটটা কুকুরে রোজ প্রায় আস্ত একটা পাঁঠা খেয়ে ফেলে। এর ওপর গোটা কুড়ি ‘গেস্ট’ বেড়াল আছে। ঠিক একটা থেকে দেড়টার মধ্যে সব লাইন দিয়ে এসে বসে। যেন মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণের কার্ড পেয়ে এসেছে। রোজ তিন কেজির মতো মাছ লাগে। সব মিলিয়ে খরচের বহর দেখে বড়মামার মাথা ঘুরে গেছে। তাই তিনি মাছের বদলে, মাংসের বদলে, ছ’রকমের ডাল কিনেছেন, চার কেজি ঘিয়ের টিন কিনেছেন। বাজার ঝেঁটিয়ে আনাজ কিনেছেন। এক বাক ছানা আর দই কিনেছেন। কিনে ফেরার পথে মোচ্ছবতলায় কীর্তন দলের সঙ্গে দেখা। তারা খোলটোল বেঁধে, টগরটগর শব্দে রেলা নিচ্ছিলেন। বিরাটিতে বায়না ছিল আজ। বড়মামার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। মাছ, মাংস, ডিম, পেয়াজ প্রভৃতি আঁশটে জিনিস ত্যাগ করলুম বললেই তো আর ত্যাগ করা যায় না, মন পালটাতে হবে। তার জন্যে একটা অনুষ্ঠান চাই। প্রস্তুতি চাই। বাড়িতে তিনদিন লাগাতার কীর্তন

লাগাও আর কাঁচকলার গুলিকাবাব, ছানার কালিয়া, দইকলার ফলার খাও। কীর্তনে কুকুরদেরও স্বভাব বদলে যাবে। তারাও ফলার খেতে শিখবে।

মাসিমা টাকা দিয়ে ঝাকামুটেদের বিদায় করলেন। ভাড়ারে পর্বতপ্রমাণ জিনিসপত্র। মাসিমা তার মাঝখানে বসে আছেন মাথায় হাত দিয়ে। রোজ দু'বেলা তিনদিনে ছ'বেলা এই এতজন লোককে রেঁধে খাওয়াতে হবে। উনুন থেকে ভাতের হাড়ি নামাতে কপিকল লাগবে। একা আনাজ কুটতে হলে একটা দিন চলে যাবে।

মাসিমা আমাকে বললেন, একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পারিস?

কী করবে ট্যাক্সি?

আমি চলে যাব। অনেকদিন ধরেই ভাবছি চলে যাবার কথা। আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না এই পাগলাগারদে থাকা।

কোথায় তুমি যাবে?

আমার বন্ধু বাসন্তীদের বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন থাকি, তারপর যা হয় ভাবা যাবে।

তখন আমরা কী করব?

সাপের পাঁচ পা দেখবে। যা প্রাণ চায় তাই করবে। পাগলদের পাগলামি দেখবে। তাদের তালে তাল দেবে। তোমার তো পোয়াবারো।

বড়মামা তখন মহা উৎসাহে কীর্তনের দলকে বসাবার ব্যবস্থা করছেন। ঘেরা বারান্দায় মোটা গালচে পড়েছে। বড়মামার ডান হাত, মাসিমার কথায় অপকর্মের শাগরেদ মুকুন্দ খুব তড়বড় করছে। মুকুন্দর চেহারাটা ঠিক ডাংগুলির মতো। কালো তেল চুকচুকে চেহারা। মাথায় ভীষণ মোটা, কালো কোকড়া চুল।

মুকুন্দ চপচপে করে সরষের তেল মাখে সারা গায়ে, মাথায়। ওর ঘরে বড়মামার দেওয়া, বড় ওষুধ কোম্পানির একটা আয়না দেওয়ালে ঝোলানো আছে। মুকুন্দ চানটান করে সেই আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। আমি তখন আড়াল থেকে দেখি। বেশ লাগে দেখতে। যেমন চুল, তেমনি চিরুনি। মোটা, চ্যাপটা বিস্কুটের মতো দেখতে। সাংঘাতিক মোটা দাড়া। বেলঘরের রথের মেলা থেকে কেনা। সাঁওতালি চিরুনি। আয়নার সামনে মহিষাসুরের মতো দাঁড়ায় মুকুন্দ। তারপর সে এক যুদ্ধ। চুলের সঙ্গে চিরুনির লড়াই। তেলজল ছিটকে ছিটকে আয়নার কাচ দেখতে দেখতে ঝাপসা হয়ে যায়। মুকুন্দর চুল আর ঠিক হয় না। মুকুন্দ কখনও নাচছে। কখনও যোগাসন করছে। চুল আঁচড়ে, সাদা গেঞ্জি আর খাকি হাফপ্যান্ট পরে ঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসত তখন ঘেমে একেবারে নেয়ে যেত।

মুকুন্দটা মহা চালু ছেলে। যেই দেখেছে বড়মামা, হরেকৃষ্ণর দলে ঢুকেছেন, ও নিজেও অমনি গুনগুন করে গাইছে— 'প্রেমদাতা নিতাই বলে গৌর হরি হরি বোল।" কোনও কাজ নেই; কিন্তু এমন করছে, যেন কাজের চোটে কথা বলার সময় নেই। এদিক যাচ্ছে, ওদিক যাচ্ছে। আমাকে দেখে বললে, "জয় প্রভু। জয় নিতাই।"

আমি কোনও উত্তর দিলুম না। ভীষণ মিথ্যে কথা বলে আমাকে। কথায় কথায় মিথ্যে কথা। আমাকে বলেছিল, সোদপুর থেকে দশখানা ভাল একতে ঘুড়ি কিনে এনে দেবে। রোজ বিকেলে কিনতে যাচ্ছি বলে বেরোয়, আর রোজই ফিরে আসে শুধু হাতে। এসে এমন সব মিথ্যে কথা বলত! একএক দিন এক-এক রকম। শেষে একদিন এসে বললে, "কুড়িখানা ঘুড়ি কিনে বগলদাবা করে

আসছিল, বৃষ্টিতে সব গলে বেরিয়ে গেল।” আমি তো অবাক। সারাটা দিন গেল রোদঝলমলে, বৃষ্টি আবার কখন হল! মুকুন্দ বললে, “শরৎকালের বৃষ্টি ওইরকমই হয়। কখনও এখানে, কখনও ওখানে।” আমি বললুম, “কই, কোথায় তোমার কাপকাঠি, বুককাঠি। কাগজ না হয় গলে গেছে, সেগুলো কোথায়?” বললে, “কাঠিকুটি সব ফেলে দিয়েছি।” তারপর থেকে আমি মুকুন্দর সঙ্গে একদম কথা বলি না। জোচ্চর। আমি মিথ্যেকথার নাম রেখেছি মুকুন্দ। আমি সেদিন চোখের সামনে দেখলুম মুকুন্দ বড়মামার সবচেয়ে ফেভারিট কুকুর লাকিকে শুধুমুধু একটা সাইড-কিক করল ও ওরকম আজকাল প্রায়ই করে। ক্যারাটে-কুংফু শিখছে কোনও এক মাস্তানের কাছে। লাকি ক্যাঁক করে উঠল। বড়মামা দোতলার বারান্দায় বসে ডিপ-ব্রিদিং করছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, “কী রে মকা মারলি নাকি?” মুকুন্দকে বড়মামা বলেন, মকা। মুকুন্দ অম্লানবদনে বললে, “কই মারিনি তো। ও আপনার বাইরের কোনও কুকুর।” আমি বড়মামাকে ফিসফিস করে বললুম, “আমার সামনে মুকুন্দ লাকিকে ক্যারাটে মেরেছে।” ও বাবা! বড়মামার উলটো চাপ! আমাকে বললেন, “প্রমাণ করতে পারবি? সাক্ষী আছে?” ও মা! আমিই তো সাক্ষী। এই পক্ষপাতিত্ব করে করেই দেশটা গেল।

আমি বড়মামাকে বলতে এসেছিলুম, মাসিমা আমাকে ট্যাক্সি ডাকতে বলেছেন। বলব কী! কীর্তনের দল বড়মামাকে ছেঁকে ধরেছে। হেড বলছেন, “তা হলে আমাদের প্রত্যেকের জন্যে একটা করে গোড়ের মালা আনান। আমার মালাটা যেন বড় হয়। আর লবঙ্গ, তালমিছরি, ডালচিনি, ষষ্ঠমধু আর বচ আনাবেন বেশি করে। বহুত চেঁচাতে হবে মালিক। আর আহারাদির ব্যবস্থা তো করবেনই।

তিন-চার রকমের ব্যঞ্জন। গোবিন্দভোগ চালের ভাত। গাওয়া ঘি-টা আমাদের একটু বেশিই লাগে। ওইটাই আমাদের শ্বাসের শক্তি। কণ্ঠকে নরম রাখে।”

আমি ভাবলুম, আহা, ওই তো গলার ছিরি। তার আবার ফিরিস্তি কত! এক ফাঁকে বড়মামাকে বললুম, “মাসিমা ট্যাক্সি ডাকতে বলছেন।”

কী বুঝলেন কে জানে! হাতের ঝটকা মেরে বললেন, এখন আমার সময় নেই। দেখছিস, বাড়িতে এত বড় একটা উৎসব!

আমাকে ডাকতে বলছেন।

কাকে ডাকতে বলছেন?

ট্যাক্সি। ট্যাক্সি ডাকতে বলছেন।

ট্যাক্সি? ট্যাক্সি কী হবে?

আপনার উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে, বন্ধু বাসন্তীর বাড়িতে চলে যাবেন।

বলিস কী? আমার উৎপাত? আমি আবার কার কী করলুম? চল তো! দেখি। এ এক অদ্ভুত বাড়ি! ভাল করলেও মন্দ, মন্দ করলেও মন্দ।

মাসিমা সেই একইভাবে বসে আছেন। কিছু দূরে মেজমামা বসে আছেন ব্যাজার মুখে। বড়মামা মাসিমাকে দেখে বললেন, আরে, এ তো নার্ভাস ব্রেকডাউনের কেস। ব্লাডপ্রেশার ফল করেছে। আমি এখনই একটা স্টিমূলান্ট ইঞ্জেকশান করে দিচ্ছি, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাসিমা বললেন, নার্ভাস ব্রেকডাউন নয়, আমার দু’জনে সিদ্ধান্ত করেছি, তোমার অপশাসন, তোমার স্বেচ্ছাচারিতা, তোমার স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হয়ে আমরা কোথাও চলে যাব। মেজদা আজকের মতো কোনও হোটেলে গিয়ে উঠবে। আর আমি চলে যাব, আমার এক বান্ধবীর বাড়ি। তারপর দু’জনে মিলে যা হয়

একটা কিছু ব্যবস্থা করব। আর যে-কটা বছর বাচি, আমরা একটু শান্তিতে বাঁচতে চাই।

বড়মামা হাঃ হাঃ করে পায়রা-ওড়ানো হাসি হেসে বললেন, খুব পাকাপাকা কথা শিখেছিস। আমার সব হাঁটুর বয়সি, বলে কিনা, যে-কটা বছর বাঁচি! জীবন এখনও শুরুই হল না। শোন, তোদের এই সিদ্ধান্তকে কী বলে জানিস! রাজনীতির ভাষায় বলে, কুয, অভ্যুত্থান, বিদ্রোহ। তোদের ভালর জন্যেই আমি একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলুম। তা দেখছি যাদের জন্যে চুরি করি, তারাই বলে চোর। স্বার্থপরের দুনিয়ার এইটাই হল নীতি।

মেজমামা বললেন, পাকাপাকি ব্যবস্থাটা কী? বছরের পর বছর ধরে সারা দিনরাত কীর্তন। এতে আমাদের কী ভাল হবে শুনি। আমরা কালা হয়ে যাব। পাগল পাগল হয়ে যাব। আমাদের কাঁপুনি রোগে ধরবে। হার্ট অ্যাটাকও হয়ে যেতে পারে! আর কী ভাল হবে শুনি?

বড়মামা বললেন, “মানুষ যখন রেগে থাকে, তখন তার বুদ্ধি কী রকম বিকল হয়ে যায় দেখেছিস! কীর্তন হল বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান অঙ্গ মস্ত বড় একটা সাধনা। এতে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম, প্রাণায়াম আছে। সুর আর তাল সহযোগে আত্মনিবেদন আছে। ভক্তি আছে। ঈশ্বরকে পাবার সব ব্যবস্থাই আছে। এতে মানুষের মনের পরিবর্তন হয়। আমরা খুনি। কত মুরগি, কত পাঠার খুনের কারণ হয়েছি আমরা। আমাদের রক্তে, আমাদের নিশ্বাসে, পেয়াজ-রসুনের ম্লেচ্ছ গন্ধ। ম্লেচ্ছ আহারে আমাদের লোভ বাড়ছে, হিংসা বাড়ছে। ক্রোধ বাড়ছে। নামগান ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই। তোদের জানা নেই, মাছ, মাংস, ডিম আমাদের কত

সর্বনাশ করে! শরীর বিষিয়ে দেয়। বাত হয়, হার্টের অসুখ হয়। নিরামিষ খেলে শরীর ভাল হয়। চেহারায় একটা লালিত্য আসে। মানুষ দীর্ঘজীবী হয়।

মাসিমা বললেন, "তুমি আমাদের নিরামিষ খাওয়াবে খাওয়াও; কিন্তু এই দলটাকে তুমি কোথা থেকে ধরে আনলে! শ্রাদ্ধের কীর্তন। সারা বাড়িতে মৃত্যুর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এদের আমি চিনি। এরা ডেডবডির পেছন পেছন গান গেয়ে ফেরে। এ-কীর্তন সে-কীর্তন নয় বড়দা। এ হল মৃত্যুর কীর্তন। এদের বাড়িতে ডেকে আনা মানে মৃত্যুকে ডেকে আনা। অলক্ষণ।

বড়মামা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মেজমামা বললেন, গণতান্ত্রিক দেশে তুমি অগণতান্ত্রিক কায়দায় অত্যাচারী ডিক্টেটারের মতো সংসার চালাচ্ছ।

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে ভাব পাল্টে বললেন, ওই অত্যাচারী শব্দটায় আমরা ঘোরতর আপত্তি। আমি স্বীকার করছি, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম। আমি একটু হুজুগে আছি। আমাকে তোরা আজ এতবড় একটা কথা বলতে পারলি। আমি অগণতান্ত্রিক! অত্যাচারী, ডিক্টেটার! বেশ, তোদের কাউকে যেতে হবে না, আমিই চলে যাচ্ছি।

বড়মামা আমাকে বললেন, এই, একটা ট্যাক্সি ডাক তো।

আপনার তো গাড়ি আছে বড়মামা!

না না, এটা গাড়ি-ঘোড়ার ব্যাপার নয়। কোথাও বেড়াতে যাওয়া নয়। এ হল গৃহত্যাগ। এদের আমি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি। আর আজ এরাই আমাকে বলছে অত্যাচারী, স্বৈরাচারী!

তা হলে আমি ক'টা ট্যাক্সি ডাকব?

আমি আমারটা বলতে পারি। আর কার কী লাগবে আমি জানি না। জানলেও বলব না।

ঠিক এইসময় মুকুন্দ সামনে এসে দাড়াল। এসেই বললে, "জয় নিতাই।" বড়মামা ভুরু কুঁচকে বললেন, "জয় নিতাই মানে?"

মুকুন্দ ভেবেছিল, খুব বাহাদুরি নেবে। বড়মামার মেজাজ দেখে চুপসে গেল। আমতা আমতা করে বললে, "ওরা সব কথায় কথায় জয় নিতাই, জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বলছে তো, তাই আমিও বলেছি। যদি অপরাধ হয়ে থাকে, আমার গালে মারুন দুই থাপ্পড়।"

এই হল ধড়িবাজ মুকুন্দর বিখ্যাত কায়দা। জানে এইতেই বড়মামা কাবু হয়ে যাবেন। ও আবার বড়মামাকে বড়দা বলে। বড়মামা কাবুও হয়ে গেলেন। বললেন, "শোন, তুই ভণ্ড নোস। কথায় কথায় জয় নিতাই, জয়ঠাকুর বলবি না।"

মুকুন্দ বললে, বাবড়িদা আরও ফিরিস্তি বের করেছে।

বাবড়িদা? সেটা আবার কে?

ওই যে দলের হেড।

কী বলছে?

বলছে, প্রভুকে বলো, একটা মাইকের ব্যবস্থা করতে; আর দু'কেটলি চা পাঠাতে বলো। এখন সন্দেশ চাই না। গরম নিমকি দিয়ে শুরু করি। আর বলছে; ভোগের ব্যবস্থা করতে।

কার ভোগ? ওদের ভোগের জন্যে তো বাজারের পুরো ভেজিটেবল সেকশানটা কিনে এনেছি।

না, না, ঝোলা থেকে এতটুকু একটা জগন্নাথদেবের মূর্তি বের করে জানলার ওপর রেখে বলছে, “ভোগ দিতে হবে।” একটা ফর্দ তৈরি করে আমাকে কী বিশ্রীভাবে বললে, “এই ছেলে, এটা তোর ডাক্তারকে দে।” আপনার প্লাস্টিক দেওয়ালে নস্যি মুছেছে। আর উঠোনের পাশে নতুন যে তিনটে গোলাপ গাছ পুঁতেছিলেন, মাড়িয়ে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে। আবার বলছে, “কেলে কেলে আটটা কুকুর পুষেছে। মানুষ খেতে পাচ্ছে না, রাজভোগ দিচ্ছে কুকুরকে। পয়সা থাকলে কী না হয়? ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ দেয়।”

তুই বিনা প্রতিবাদে এইসব শুনে এলি!

আপনার লোক !

তুই কার লোক?

আপনার লোক।

আমার লোক হয়ে, আমার নিন্দে শুনে এলি?

নিন্দে তো তেমন করেনি। বড়লোক বলেছে।

বড়লোক বলাটা একটা গালাগাল। এই বুদ্ধিটুকু তোর ঘটে নেই! যা, এইবার তুই গিয়ে বৃন্দাবন দেখা।

কীভাবে দেখাব? ক্যারাটে, কুংফু চালিয়ে দেব? দেখব একসঙ্গে এগারোটিকে পারা যায় কি না?

কিছু করতে হবে না, তুই একসঙ্গে আমাদের আটটা কুকুরকে একবার খেলিয়ে দে, এধার থেকে ওধার।

মেজমামা বললেন, বড়দা যা করবে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে করবে। তোমার মনে আছে, ফুলচুরি বন্ধের জন্য তুমি একবার কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলে।

সেই কুকুর লাটু বলে একটা ছেলেকে কামড়েছিল। লাটুর বাবা দলবল নিয়ে বাড়ি চড়াও হয়েছিল। থানা পুলিশ, শেষ পর্যন্ত পার্টি। শেষ পর্যন্ত অপমানজনক অবস্থায় তোমাকে হাজারটা টাকা দিতে হল। টুলের ওপর উঠে দাড়িয়ে ক্ষমা চাইতে হল। তোমার ভুলোমন, ভুলে যেতে পারো। তোমার অপমান আমরা ভুলিনি। বেদনার মতো বিঁধে আছে মনে। সে ব্যথা, কী যে ব্যথা!"

বড়মামা মেজমামার কথায় অভিভূত হয়ে বললেন, অ্যাঁ বলিস কী? সেই অপমানের বেদনা কণ্টক সম খোঁচা মেরে আছে মানসমন্দিরে!

মেজমামা বললেন, এই আবেগের মুহূর্তে তোমার ভাষা-সংশোধনের চেষ্টা আমি করব না। এইটুকু বলতে পারি সাহিত্য তোমার লাইন নয়। তবে জেনে রাখো, আমরাই তোমার প্রকৃত আপনজন।

মাসিমা বললেন, দাদা মনে করে, আমরা দাদার কেউ নই। দাদার যত আপনজন রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে আছে। দাদা আমাদের পরামর্শ নেবে না। দাদার যত পরামর্শদাতা হল বাইরের লোক। তুমি আমাদের যখন চাও না, আমরা তখন চলেই যাই।

বড়মামা বললেন, চান্স পেয়েছিস, এখন আমাকে যত পারিস আঘাত কর। এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো। এই করেছ ভাল নিঠুর হে।

মুকুন্দ বললে, আমি তা হলে আটটা কুকুরকে খেলিয়ে দিই। জিনিসটা বেশ জমে যাবে। এদের পেছনে পার্টির কোনও লোক নেই। না সিপিএম, না কংগ্রেস!

মেজমামা বললেন, "তোমাকে পাকামো করতে হবে না। আমরা দেখছি। এটা বড়দের ব্যাপার। আমাদের একটা মানসম্মান আছে।" মেজমামা আর আমি

যখন বারান্দার সামনের উঠোনে ফিরে গেলুম তখন কীর্তনিয়ারা বেশ জাকিয়ে বসে গেছে। তিলকমাটি বের করে সব দগদগে রসকলি করেছে। কপাল থেকে একেবারে নাকের ডগা পর্যন্ত। কপালে মেরেছে তে-দাড়ি।

আমাদের আসতে দেখে দলের হেড অমনি উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কই, কী হল, মাইক আনতে গেছে? চা কোথায়? চা! খোকা কই, সিগারেট তো পাঠালে না।" আর একজন অমনি পাশ থেকে আখর দিয়ে উঠলেন, "লবঙ্গ আর বচ?"

কীর্তনের দল তো! কথাও বলেন সব কীর্তনের কায়দায়। একজন ছাড়েন তো আর একজন পাশ থেকে ধরে নেন। মেজমামা সামনে গিয়ে দাড়ালেন। দাড়িয়েই দুটো হাত মিশনারি ফাদারদের কায়দায় ওপরে তুললেন। দলের লোকেরা সব চুপ মেরে গেল।

মেজমামা যেন ইলেকশনের বক্তৃতা দিচ্ছেন, (বন্ধুগণ, অনিবার্য কারণে আজ এখানে কীর্তন হবে না। আপনারা দয়া করে শোরগোল করবেন না। আমাদের আটটা কুকুর কীর্তন একেবারে সহ্য করতে পারে না। শুনলেই খেপে গিয়ে চেন ছিঁড়ে তেড়ে যায়। তখন আর তাদের সামলানো যায় না। আষাঢ় মাসে রথের সময় একটা কুকুর ভগবানদাস বাবাজিকে এমন কামড়েছিল যে সাতটা স্টিচ করতে হয়েছে। আমার অনুরোধ আপনারা সব মালপত্র গুছিয়ে নিন। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে হরিনাম চলে না। হরিনাম করতে হবে নির্জনে। নিরাসক্ত মনে। আপনাদের একটা লম্বা সিধে দেবার ব্যবস্থা করেছি আমরা। সঙ্গে ভাল প্রণামী। আপনারা যে-যার জায়গায় শান্ত হয়ে বসুন। ছটফট করবেন না।

আমাদের সবচেয়ে মেজাজি কুকুরটা চেন ছিড়ে বেরিয়ে গেছে। যে-কোনও মুহূর্তে ছিটকে চলে আসতে পারে।)

মেজমামা অন্দরমহলে ফিরে এলেন। বিজয়ীর মতো।

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, কী, ম্যানেজ করতে পারলে?

পারব না মানে, কার ভাই দেখতে হবে তো!

মেজমামার এই একটা গুণ। বড়মামার সঙ্গে লাঠালাঠি ফাটাফাটি হয়ে যাবার পর বোঝা যায় মেজমামা বড়মামাকে কত ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। এই যে বললেন, 'কার ভাই দেখতে হবে তো' শুনে বড়মামার মুখে রামচন্দ্রের মতো অদ্ভুত একটা হাসি ফুটল। বেতের মোড়া থেকে উঠে এসে মেজমামাকে জড়িয়ে ধরলেন।

মাসিমা বললেন, "আহা! কী সব ছিরি! ক্ষণে ক্ষণে বহুরূপীর মতো রূপ পালটায়। এই তরোয়াল হাতে লড়ছে এই আবার ইদের কোলাকুলি!

বড়মামা বুকপকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে মেজমামার হাতে দিয়ে বললেন, কিছু কিনে খাস।

মাসিমা বললেন, "আমরা শুধু দেখব?

বড়মামা হাসিহাসি মুখে বললেন, এটা একেবারে আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। খুব ভেতরের ব্যাপার। ও যখন স্কুলে পড়ে আমি তো তখন খুব বড়। গোঁফ দাড়ি গজিয়ে গেছে। হাতে পায়ে লোম বেরিয়ে গেছে। দুই ভাইয়ের সংসার। তুই তো তখন প্যাস্তাখ্যাচা এতটুকু একটা মেয়ে। সারা দিন রাত কেবল উঁ উঁ করে নাকে কান্না। তোর অবশ্য দোষ ছিল না। ওইটুকু একটা মেয়ে কী আর করতে পারে বল! তা ছাড়া ছোট ছোট মেয়েদের শুয়োপোকার মতো খুব খিদে

হয়। তোকে খাওয়ানোর মতো অত খাবার তখন আমি পাব কোথায়। সকালে ডাল-ভাত, রাতে গুড়-ছাতু এই তো তখন চলছে। অভাবে অভাবে সবসময় আমার মেজাজ ঠিক থাকত না। ভাইয়ে ভাইয়ে মাঝেমধ্যেই ঘষাঘষি হয়ে যেত। আমারই দোষ, দাদাগিরি ফলাতে হবে তো। তখনও এইরকম রামলক্ষ্মণের মিলন হত। আমি আমার কলার-ফাটা ছেড়া জামার পকেট থেকে দুটো পয়সা বের করে মেজকে দিতুম, ও অমনি ছুটে গিয়ে কিনে আনত পাঁচটা গুলি লজেন্স। আমরা তিনজনে দুপুরবেলা আমাদের ভাঙা ছাদে বসে বসে খেতুম। দূর থেকে ভেসে আসত বড়লোকেদের বাড়ির রেডিয়োর গান। কী সব সুন্দর গান ছিল তখন, শিল্পীমনের বেদনা নিঙাড়ি, পথেই জনম পথেই মরণ আমাদের, জীবননদীর জোয়ার ভাটায় কত ঢেউ ওঠে পড়ে। উঃ সে সব কী টেরিফিক দিন গেছে আমাদের। সেইসব সুখের দিন আর ফিরবে না। ভাঙা মেঝেতে ফাটা কলাপাতায় ডাল ভাত। কোষো পেয়ারা শিলে থেতো করে নুন আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে আচার। তোকে ফ্রক কিনে দেবার পয়সা নেই, পুজো এসে গেছে। উঃ কী উত্তেজনা! কুসিটার ফ্রক হবে না। মেয়েটা পুজোয় পাবে না কিছু। শেষে কাপড় কিনে এনে পুরনো ফ্রক ফেলে ছাট কেটে, সারারাত কুপির আলোয় বসে বসে সেলাই। কোথায় লাগে তোর উপন্যাস ! মাই লাইফ ইজ এ উপন্যাস।

মেজমামার আবার কথায় কথায় চোখে জল চলে আসে। বড়মামার কথায় চোখ ছলছলে হয়ে এসেছে।

মেজমামা বললেন, মনে আছে, তুমি কত কষ্ট করে আমাকে স্কুলে ভরতি করেছিলে! তারপর সেই ফ্রি-শিপের জন্যে তোমার অপমান দিনের পর দিন ঘুরিয়ে সেক্রেটারি তোমাকে কী বললেন?

উঃ, সে এক জিনিস রে ভাই! রাত সাতটা অবধি বসিয়ে রাখার পর বাবু আমাকে বললেন, ‘কোন বংশের ছেলে তুমি! ভাইকে ফ্রি-তে পড়াতে তোমার লজ্জা করবে না! মান-সন্মানে লাগবে না। স্কুলের ক’টা টাকাই বা মাইনে। তুমি কি বলতে চাও সেই কটা টাকা তুমি জোগাড় করতে পারবে না? ফ্রি-তে পড়লে তোমার ভাইয়ের মনে অবস্থা কত হীন হয়ে যাবে একবার ভেবে দেখেছ! আহা, অন্য কেউ নয়, তোমার নিজের ভাই। তাকে কি এইভাবে তোমার ফাকি দেওয়া উচিত? আমি চেয়ার উলটে দিয়ে পালিয়ে এসেছিলুম। সেইদিন আর একবার ভাল করে বুঝেছিলুম, দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। তারপর আমি করলুম কী? আমার হাত আছে, পা আছে, মাথা আছে, ভাইটাকে লেখাপড়া শেখাতে পারব না! খাটালের রামখেলোয়ানকে বললুম, ‘তুমি আমাকে সাহায্য করো? রাম আমার খুব বন্ধু ছিল। রাম আমাকে ফ্রি দুধ খাওয়াত বলেই না, আজ আমার এই স্বাস্থ্য। রাম বললে, ‘কী সাহায্য মেরা গোপাল!’ ‘আমি তোমার কাছে গোবর কিনব। তোমাকে একটু দাম কমাতে হবে।” রাম বললে, ‘গোবর কী করবে?’ ঘুটে দেব।” “তুমি ঘুটে দেবে? সব শুনে বললে, “তোমার যত লাগে ফিরি নিয়ে যাও। উঃ, সে কী উত্তেজনা। সারা সকাল, গোটা দুপুর পাঁচিলে পাঁচিলে ঘুটে দিচ্ছি থ্যাপ থ্যাপ করে। প্রথম দিন তো এমন ঘেন্না, নিজের ডান হাতে খাবার তুলে খেতে পারি না। আমাকে দাবিয়ে রাখবে ব্যাটা সেক্রেটারি! ওপর থেকে দেখ— এই আমার ভাই, ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট, গোল্ড মেডালিস্ট। পেরেছ আটকাতে কুচক্র ধনগোপাল?”

মেজমামা হঠাৎ নিচু হয়ে বড়মামার পায়ের ধুলো নিলেন। বড়মামা কাঁধ ধরে তুললেন। মেজমামার গাল বেয়ে জল নামছে। মেজমামা বড়মামার দুকাঁধ ধরে বললেন, "বড়দা, তুমি কত বড়! তোমার চরিত্রের একটুও যদি পেতুম!"

বড়মামা বললেন,তুই আমার গর্ব।

মেজমামা বললেন, তোমার একটা জীবনী লেখো।

আমার বাংলা আসে না।

তুমি যেমন বলো বলে যাবে, আমরা লিখে যাব।

বিরাট সিধে আর পাঁচশো টাকা নিয়ে কীর্তনের দল চলে গেল। মুকুন্দর ভীষণ রাগ। দেখো তো মাসি কী কাণ্ড! কোনও মানে হয়! কেমন টাকাটা মেরে নিয়ে চলে গেল।" মুকুন্দর সম্পর্ক পাতানোর যেমন ছিরি। বড়মামাকে বলছে বড়দা আর মাসিমাকে বলছে মাসি। আমাকে বলতে এসেছিল, আমি পাত্তা দিলুম না। সেই ঘুড়ির ঘটনার পর আমার পিত্তি চটে আছে। মুকুন্দ সেটা বুঝতে পেরেছে। আমার দুটো হাত ধরে বললে, "তুমি আমার সঙ্গে কথা না বললে ভীষণ খারাপ লাগে। তুমি আমার ওপর রাগ করেছ। আমি ইচ্ছে করেই তোমার জন্যে ঘুড়ি আনিনি। কেন বলো তো। ভাদ্রমাসের রোদ খুব খারাপ। তুমি সারাদিন রোদে ঘুড়ি ওড়াবে, রং কালো হয়ে যাবে, পিত্তি পড়ে চোখ হলদে হয়ে যাবে। বিশ্বাস করো আমি সেটা চাই না। তোমাকে আজ আমি কানাই মোদকের গোলাপি ছানার মুড়কি খাওয়াব।"

ছানার মুড়কি আমার খুব প্রিয়। মুকুন্দর সঙ্গে আবার ভীষণ ভাব হয়ে গেল। ছেলেটা ভেরি গুড়। আমাকে একবার কাঁধে করে স্কুলের মাঠ থেকে এক মাইল পথ হেঁটে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। আমাদের ম্যাচ হচ্ছিল। আমি ব্যাকে

খেলছিলুম। চার্জ করতে গিয়ে পা মচকে গেল। মুকুন্দ এসেছিল আমাদের টুর্নামেন্ট দেখতে। কাঁধে পা ঝুলিয়ে বসে আছি, মুকুন্দ গান গাইতে গাইতে চলেছে। সে কত রকমের গান ! গান থামিয়ে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছে, কেমন হচ্ছে! আমার লেখা, আমার সুর।

বড়মামা চেম্বারে যাবার জন্য তৈরি। বড়মামা এইভাবে বেশিদিন ডাক্তারি করতে পারবেন না। চেম্বারের অবস্থা আমি দেখতে পাচ্ছি। রোগীতে ভরে গেছে। কারও জ্বর, কারও কাশি, কারও পেটব্যথা। সবাই বসে আছেন তীর্থের কাকের মতো। কম্পাউন্ডারদা সামলাচ্ছেন। বড়মামার পাত্তা নেই।

মাসিমা মালপত্র নিয়ে বিপদে পড়েছেন। অত ছানা। অত দই। এত আনাজ !

মেজমামা বললেন, তোরা ভুলে গেছিস ভাই, আজ আমার জন্মদিন। তোরা ভুলেছিস ঈশ্বর ভোলেননি। দেখ কত আয়োজন করে দিলেন।

মাসিমা বললেন, তুমি আবার ভাদ্রমাসে জন্মালে কবে! তুমি তো জন্মেছিলে আশ্বিনে!

তোর কিছু মনে থাকে না কুসি। আমি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছি ভাদ্রে এবং ঠিক আজকের দিনটিতে। আশ্বিনে জন্মেছিস তুই; যে কারণে তোকে ঠিক মা দুর্গার মতো দেখতে।

তা হলে আজ তোমার জন্মদিন করে ফেলা যাক।

মাসিমা বললেন আমাকে, মুকুন্দকে একবার ডাকো তো।

মুকুন্দ বিশাল গালচেটা তুলছে তখন। হিমসিম অবস্থা। কম ভারী? মুকুন্দর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে। সাহায্য করতে করতে বললুম, "মাসিমা ডাকছেন। আজ মেজমামার জন্মদিন।"

বুঝেছি আমাকে মাছ আনতে বলবেন। জন্মদিনে মাছের মুড়ো খেতে হয়।

কথাটা সবে শেষ করেছে মুকুন্দ, গেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন দুই পুলিশ অফিসার। পুরো ইউনিফর্ম। মাথায় টুপি গেটের লোহাটাকে পুলিশি মেজাজে ঠ্যাং ঠ্যাং করে বাজালেন। ভুরু কুঁচকে তাকাতে লাগলেন।

মুকুন্দ বললে, এই রে পুলিশ!

আর বড়মামা ঠিক ওইসময় বেরিয়ে এলেন। হাতে ব্রিফকেস। সাদা ধবধবে শার্টের ওপর মহাদেবের গলার সাপের মতো স্টেথিস্কোপ ঝুলছে। এই বুকদেখা যন্ত্রটা বড়মামার গর্বের বস্তু। সামনেই বিশালাকার দু'জন পুলিশ অফিসার দেখে বড়মামা থতমত খেয়ে গেলেন।

একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ডক্টর সুধাংশু মুখাজি?

বড়মামা ভীষণ নার্ভাস হয়ে গিয়ে বললেন, আজ্ঞে না।

এইটাই তো ডক্টর সুধাংশু মুখার্জির বাড়ি?

বড়মামা অম্লান বদনে বললেন, "আজ্ঞে না।

এই যে বাড়ির বাইরে লেখা রয়েছে।

বড়মামা বিপদে পড়ে গেছেন। অবাক হয়ে বললেন, তাই নাকি?

পুলিশ অফিসার ব্যঙ্গের গলায় বললেন, নিজের বাড়ি নিজে চিনতে পারছেন না! নিজের নাম তো ভুলেইছেন। চলুন, ভেতরে চলুন, আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

বড়মামা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছেন। পেছন পেছন বীরদর্পে আসছেন দুই পুলিশ অফিসার। একজনে হাতে গোল একটা রুলকাঠ। সেই কাঠটাকে বা হাতের তালুতে পটাশ পটাশ করে মারছেন। বিশ্রী একটা গা ছমছম করানো শব্দ হচ্ছে।

মুকুন্দ বললে আমার কানে কানে, "এ ওই কীর্তনঅলাদের কাজ। সোজা থানায় গিয়ে মানহানির মামলা ঠুকে দিয়েছে। আমাদের দেশের ঘরে এইরকম প্রায়ই হয়। পুলিশ যদি বড়দাকে ধরে নিয়ে যেতে চায়, আমি ফাইট দেব। মিঠুন আমার গুরু। ওই পাঁচিলের ওপর থেকে উড়ে গিয়ে জোড়া পায়ে মারব থুতনিতে। তারপর বড়দাকে নিয়ে এসকেপ করব জঙ্গলে।

জঙ্গল পাবে কোথায়?

আরে ম্যান, এত বড় একটা দেশ জঙ্গল পাব না মানে!

আমরাও পায়ে পায়ে বসার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলুম। এই সময়টায় আমাদের বড়মামার কাছাকাছি থাকতে হবে। বাড়িতে চোর পড়লে মানুষ পুলিশ, পুলিশ করে চিৎকার করে। আমাদের বাড়িতে পুলিশ পড়েছে বলে আমরা পুলিশ, পুলিশ করে চিল্লে বাড়ি মাথায় করব।

বড়মামা কিছু বলার আগেই পুলিশ অফিসার দু'জন বিরাট শব্দে চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। যার হাতে রুলকাঠ তিনি টেবিলের পাশে অকারণে শব্দ করলেন। কোনও মানে হয় না। আমার স্কুলের হেডসার হলে, মাথায় ডাস্টার

মেরে বলতেন, “এ কী অসভ্যতা!” ও-সব পুলিশ অফিসার টফিসার মানতেন না। আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, বড়মামার বাড়ি, বড়মামার ঘর, তারই চেয়ার টেবিল, অথচ পুলিশ অফিসার প্রায় ধমক মেরেই বড়মামাকে বললেন, “বসুন।”

বড়মামা ভয়ে ভয়ে চেয়ারে বসতে গিয়ে হাতলে বাধা পেলেন। বড়মামার কীর্তি তো! ভাবলেন মনে হয়, চেয়ার বসতে দিচ্ছে না। মেঝেতেই বসতে গেলেন !

অফিসার বললেন, কী হল! চেয়ারে বসতে কী অসুবিধে হল?

বড়মামা বললেন, চেয়ারটা বসতে দিচ্ছে না।”

অফিসার দু’জন হা-হা করে হেসে বললেন, চেয়ারের প্রাণ আছে বুঝি, যে বসতে দিচ্ছে না! আপনি তো হাতলে বসছিলেন। চেয়ারে বসতে হলে দু’হাতলের মাঝখানে বসতে হয়। সবকিছুরই একটা হিসেব আছে ডক্টর মুখার্জি। আবার চেষ্টা করুন। ট্রাই এগেন।

আমার খুব রাগ হল। বড়মামার মতো একজন মানুষকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা। আমি মুকুন্দকে ইংরেজিতেই বললুম, “হোয়াট ইজ দিস?” আমাদের পেছনে মেজমামা এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা খেয়াল করিনি।

মেজমামা বললেন, ব্যাপারটা কী। তোরা এখানে গুপ্তচরের মতো দাঁড়িয়ে তৈরি হচ্ছি।

“পুলিশে ধরেছে মানে!” মেজমামা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, “তোরাও আয়। কার হুকুমে পুলিশ ঢুকেছে বাড়িতে!” মেজমামার টেরিফিক সাহস।

বিদ্যাসাগরি চটির ফটাস ফটাস আওয়াজ তুলে মেজমামা বিদ্যাসাগরের মতোই বেপরোয়া ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকলেন। মেজমামার পরনে ঢোলা পাজামা,

পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির রং গেরুয়া। পাঞ্জাবির পকেট থেকে সোনার ঠোট লাগানো পাইপ বের করে দাতে চেপে ধরে একেবারে সায়েবদের মতো উচ্চারণে বললেন, "হোয়াট ইজ দিস!" মেজমামার সেইরকম চেহারা। বড়মামার চেয়েও অনেক সুন্দর দেখতে পাকা পেয়ারার মতো গায়ের রং। এক মাথা হালকা বাদামি রঙের চুল। তেমনি সুন্দর স্বাস্থ্য! এতখানি বুকের ছাতি। চওড়া পিঠ। ভারী চশমার আড়ালে বড় বড় জ্বলজ্বলে দুটো চোখ।

একজন অফিসার পায়ের ওপর পা তুলে বসেছিলেন। তাঁর বুটের ডগাটা পালিশ-করা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পাশে লেগে দাগ ধরিয়ে দিচ্ছিল। মেজমামার সজাগ চোখ। হাতের ফরসা, লম্বা তর্জনী তুলে অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "সি, হোয়াট ড্যামেজ ইউ হ্যাভ ডান টু দি টেবল, উইথ ইয়োর আনসিভিলাইজড বুট। ছিঃ ছিঃ ! ম্যানার্স জেন্টলম্যান, ম্যানার্স।"

মেজমামা আমাকে ইংরেজি শেখান। বলতে নেই মা সরস্বতীর কৃপায়, আমি এবার ইংরেজিতে সাংঘাতিক ভাল নম্বর পেয়েছি। আমি বুঝতে পারলুম কেমন কায়দা করে মেজমামা অফিসারকে অসভ্য বললেন? তুমি অসভ্য নও, তোমার বুট অসভ্য। সেই অসভ্য বুট চকচকে টেবিলের কী সর্বনাশ করেছে দেখো।

অফিসার দু'জন মেজমামার দিকে তাকালেন। কলকাতার সবচেয়ে নামী কলেজের নামী অধ্যাপক। তার সঙ্গে চালাকি !

মেজমামা আরও এক ডোজ চড়িয়ে দিলেন, "দিস ইজ নট ইয়োর পুলিশ স্টেশান। বিহেভ ইয়োরসেলফ।"

মেজমামা আমাকে অনেকরকম কায়দা শেখান। এই কায়দাটা সেই কায়দারই একটা, অফেনস ইজ দি বেস্ট ডিফেনস। পুলিশ অফিসার একেবারে চুপসে গেলেন। তাড়াতাড়ি পা নামিয়ে নিলেন। মেজমামা ডোজ আরও একটু চড়ালেন। একেবারে সামনে গিয়ে পাইপ নেড়ে বলেন, "ও নো নো, ওয়াইপ অফ দি স্ক্র্যাচ উইথ ইয়োর হ্যান্ডকারচিফ।"

মেজমামা একটা চেয়ারে রাজার মতো বসে বললেন, হোয়াট ব্রিঙ্গস ইউ হিয়ার।

এক অফিসার দাগ পরিষ্কার করছেন, তিনি কিছু বললেন না। অপরজন বললেন, আমরা একটা চুরির ইনভেস্টিগেশানে এসেছি।

চুরির ইনভেস্টিগেশানে এখানে? ষ্ট্রেঞ্জ!

মেজমামার পাইপ ধরানোর সাংঘাতিক একটা কায়দা আছে। ভেরি ভেরি আর্টিস্টিক। দেশলাই কাঠিটা জ্বেলে, বাঁ হাতে পাইপের মুখের দিকটা ধরে ডান হাতে আগুনটা ওপর থেকে নীচের দিকে নামিয়ে দিতে হয়। দেখতে ভাল লাগে। সায়েবি ব্যাপার তো। মেজমামা সেই কায়দায় পাইপ ধরাতে ধরাতে বললেন, "আমরা কী চুরি করেছি বলে মনে হচ্ছে আপনাদের?"

সাইকেল।

আচ্ছা, সাইকেল! কার সাইকেল? আপনার?

তার আগে জানা দরকার, আপনি কে?

আমি মেজভাই।

কী করেন আপনি?

চোরাই সাইকেলের ব্যাবসা করি। আপনি টেবিলের পাশের নোংরা জুতোর দাগ মুছেছেন!

মেজমামা এমন মেজাজ নিয়ে বললেন, যে পুলিশ অফিসার ভয়ে ভয়ে বললেন, এই যে সার, মুছে দিচ্ছি সার, মোছার জন্যে আমাকে যা হয় একটা । কিছু দিন।

আপনার পকেটে রুমাল নেই?

না, সার, আমাদের সার্ভিসে আমরা তো রুমাল ব্যবহার করতে পারি না। অনেকে সঙ্গে রাখেন, আমি তাও রাখি না।

আই সি। তা হঠাৎ যদি হেঁচে ফেলেন, আর সেই হাঁচির চোটে নাক দিয়ে যদি কিছু বেরিয়ে আসে, তা হলে কী করবেন? জামার হাতায়?

আজ্ঞে, সেইরকম কেস কখনও হয়নি। হলে জামার হাতা। একটা রুমাল রাখা উচিত কী বলেন?

"যে-কোনও সভ্য মানুষেরই একটা রুমাল রাখা উচিত। সিভিলাইজেশানের সঙ্গে রুমালের একটা যোগ আছে অফিসার।" পুরো ব্যাপারটা এখন মেজমামার কন্ট্রোলে এসে গেছে। বড়মামা সেই কারণে একটু সাহস পেয়ে বললেন, "চেম্বারে আমার রুগিরা বসে আছে, আমার তো যাওয়া উচিত।"

প্রথম অফিসার বললেন, আপনি পার্থ মুখার্জিকে চেনেন?

বড়মামা বললেন, না, পার্থ মুখার্জি আবার কে? জীবনে নাম শুনিনি।

জজ পার্থ মুখার্জির নাম শোনেননি? চেনেন না আপনি?

মেজমামা ঠোঁট থেকে পাইপ নামিয়ে বললেন, আমরা জাস্টিস পার্থ ব্যানার্জিকে চিনি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, পার্থ ব্যানার্জি।

মেজমামা বললেন, স্ট্রেঞ্জ! আপনি মশাই পুলিশ অফিসার হয়েছেন জজসায়েবের টাইটেল জানেন না! এদিকে সবচেয়ে নামকরা একজন ডাক্তারকে সাইকেল চোর বলে সন্দেহ করছেন। ব্যাপারটা খোদ জজসায়েবকেই তা হলে জানাতে হয়। দেখি ফোনে পাওয়া যায় কি না!"

মেজমামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, পার্থমামাকে ফোনে ধর তো।

অফিসার চেয়ার থেকে ক্যাঙারুর মতো লাফিয়ে এসে মেজমামার হাত চেপে ধরে বললেন, প্লিজ, প্লিজ, ডোন্ড ডু দ্যাট। আমি ধনে-প্রাণে মারা যাব। জজসায়েব ভীষণ রাগী!

আপনি এই বাড়িতে এই মুখার্জিহাউসে ঢোকার আগে অনুমতি নিয়েছিলেন? আসতে পারি বলেছিলেন? বলেছিলেন, মে আই কাম ইন?

না সার।

এই সহজ সরল, আত্মভোলা ডাক্তারটিকে নিয়ে পুলিশি কায়দায় খেলা করছিলেন?

আজ্ঞে, আপনি আসার আগে পর্যন্ত অভ্যাসের দোষে তা একটু করে ফেলেছি। উনি ভয় না পেলে করতুম না। ভীষণ ভয় পেয়েছেন দেখে একটু মজা করে ফেলেছি সার। আসলে আমরা ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি সার। আজ সকালে জজসায়েবের বারান্দা থেকে তার নতুন সাইকেলটা চুরি হয়ে গেছে। মাত্র তিনদিন আগে কিনেছিলেন।

স্ট্রেঞ্জ! সেই সাইকেল আমরা চুরি করেছি, এইরকম একটা অসম্মানজনক ধারণা আপনার হল কী করে?

আহা, আমি বলার আগেই তো আপনি এক-একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলছেন। আহা, আমিও তো পুলিশ অফিসার! আমার একটা পদমর্যাদা আছে কি না! সেই থেকে আপনি আমাদের সঙ্গে কী যাচ্ছেতাই ব্যবহার করছেন বলুন তো!

আপনার পায়ে কী?

থতমত খেয়ে গেলেন অফিসার। পায়ের দিকে তাকালেন। মেজমামা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা একজন এগজামিনার। এমনভাবে প্রশ্ন করেন, সবাই পড়া না করা ছাত্রের মতো ভয় পেয়ে যায়। অফিসার দুদণ্ড ভাবলেন। ভেবে বললেন, পায়ে জুতো।

জুতো পায়ে ঢুকলেন কেন? না, না, আপনি এই ঘরে জুতো পায়ে ঢুকলেন কেন? আপনি ওই নোটিশটা পড়েননি, লিভ ইয়োর শুজ আউট? আপনি দেখছেন না, এই ঘরটা একটা স্মৃতিমন্দিরের মতো? বাইরের জুতো পরে এই ঘরে প্রবেশ নিষেধ।

আপনার পায়ে যে জুতো।

এটা আমার বাড়িতে পরার চটি। বাইরের জুতো পায়ে মশমশিয়ে এসে ঢুকলেন। তার মানে আপনি শ্রদ্ধাভক্তি নিয়ে বিনীতভাবে আসেননি। এসেছেন পুলিশি মেজাজে যেভাবে আপনারা গুন্ডা-বদমাশ-চোরদের বাড়িতে যান। আপনি কাদের বাড়িতে এসেছেন, কোনও আইডিয়া আছে? জমিদার কাশীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে, যে ভদ্রলোক দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যে সমস্ত কিছু উৎসর্গ করেছিলেন। চোদ্দোটা বছর ইংরেজের জেলে কাটিয়েছিলেন। আপনার চালচলন-ব্যবহার আমাকে ভীষণ ইরিটেট করেছে।

অফিসার একেবারে হাত জোড় করে বললেন, আমি ক্ষমা চাইছি। আমাদের সমস্ত ব্যাপারটাই দানবীয়। সত্যি কথা বলতে কী, আমরা ভদ্রসমাজে মেশার অনুপযুক্ত।

মেজমামা বললেন, হ্যাঁ, এইবার ঠিক আছে। এই স্বীকারোক্তিটাই আমি চাইছিলুম। এইবার আমি আপনাদের জন্যে ভুরভুরে গন্ধঅলা দার্জিলিং চায়ের ব্যবস্থা করব। নকুড়ের কড়াপাক, নরমপাক, মুচমুচে নিমকি। আর বলুন, আর কী ইচ্ছা করেন।

লাজুক লাজুক মুখে এক অফিসার বললেন, ওই যে এক রকমের মিষ্টি আছে না! গোল গোল। রসগোল্লা, তবে ঠিক রসগোল্লা নয়। ওপরটা কড়াপাক, ভিতরটা নরম। সারা গায়ে গুড়ো গুড়ো যেন পাকা দাড়ি বেরিয়েছে।

ফুলের মতো দেখতে, তাই তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ ক্ষীরকদম্ব। ওই নামটা আমার কিছুতেই ছাই মনে থাকে না।

অফিসার শরীরটাকে এতক্ষণ টানটান করে রেখেছিলেন, এইবার আলগা করলেন।

মেজমামা বললেন, আমাদের ফ্রিজে প্রচুর ক্ষীরকদম্ব আছে। কটা খাবেন? একডজন বলি।

মেজমামা মুকুন্দকে ইশারা করলেন। মুকুন্দ বুলেটের মতো ভেতর বাড়ির দিকে চলে গেল। আমি জানালার ধাপে পা ঝুলিয়ে বসে বসে মজা দেখছি। আমার ভয় কেটে গেছে। মেজমামার হাতে পড়ে কেস একেবারে ঘুরে গেছে। এখন মনে হচ্ছে, বড়মামার বদলে পুলিশ অফিসারই না অ্যারেস্ট হয়ে যান।

মেজমামা ব্লপ করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, নিন, কেসটা এইবার ক্লোজ করুন। মনে রাখবেন, ডক্টর মুখার্জির সময়ের দাম আছে। টু ইজ হিম, টাইম ইজ মানি।

অফিসার ভদ্রভাবে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, আপনারা আজ সকালে জাস্টিস মুখার্জির কাছে...।

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে পাইপ উঁচিয়ে বললেন, কারেকশান। কারেকশান। মুখার্জি নয় ব্যানাজি।

ইয়েস সার, ইয়েস সার। সরি সার। আমার মাথায় একবার থান ইট ছুড়ে মেরেছিল। সেই থেকে আমার স্মৃতিটা একটু এলিয়ে গেছে। জাস্টিস ব্যানার্জির বাড়িতে আপনারা কাউকে পাঠিয়েছিলেন কি?

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না। কই না তো!

ইস! বড়মামা আবার ভুল করলেন। বড়মামা সকালে মুকুন্দকে পাঠিয়েছিলেন, আমার সামনে। বড়মামা মুকুন্দকে কম্পাউন্ডার করবেন। সেইজন্যে একটা সার্টিফিকেট আনতে পাঠিয়েছিলেন। বড়মামার কিছুই মনে থাকে না কেন। বড়মামার সবেতেই, না।

অফিসার বললেন, আর একটু ভেবে বলুন। জজসায়েবের স্ত্রী তো মিথ্যে বলবেন না। আদালত অবমাননার দায়ে পড়ে যাবেন। তিনি বললেন, "ডাক্তারবাবু একজনকে পাঠিয়েছিলেন। সে চলে আসার পর থেকেই সাইকেল হাওয়া।" তাই আমরা গন্ধ শুকে শুকে চলে এলুম আসল জায়গায়।"

মেজমামা বললেন, "বড়দা, তুমি পাঠিয়েছিলে কাউকে? মনে করে দেখো।"

বড়মামা ভুরুর ওপরে কপালে তিনবার টুসকি মেরে লাফিয়ে উঠলেন, “ওই যে ব্যাটা মুকুন্দ। মুকুন্দকে পাঠিয়েছিলুম।” আর ঠিক সেই সময় মুকুন্দ বিশাল একটা ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল। মাসিমার সাজানো। সে এক দেখার জিনিস। চোর ডাকাত মাথায় উঠে যাবার অবস্থা। সুন্দর প্লেট। সুন্দর সোনালি বর্ডার দেওয়া গেলাস। টলটলে জল। মাসিমা আবার জলে চন্দন মেশান।

বড়মামা হঠাৎ হুংকার ছাড়লেন, এই ব্যাটা মুকুন্দ। ব্যাটা সাইকেল চোর।

মুকুন্দ অবাক হয়ে বললে, যাঃ বড়দার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।”

পুলিশ অফিসার বললেন, তুমি আগে সাবধানে রাখো। এখন আর অন্য কোনওদিকে মন দিয়ো না।

মুকুন্দ ট্রে-টা টেবিলের ওপর রাখার সঙ্গে সঙ্গেই এক অফিসার খপ করে তার হাত চেপে ধরে বললেন, সাইকেলটা কোথায় রেখেছ?

মুকুন্দ বললে, গোয়ালঘরের পাশে।

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, অ্যারেস্ট হিম। এখনই ওকে শ্রীঘরে পাঠান। বছর পাঁচেক ঘানি ঘুরিয়ে আসুক। ব্যাটার যেমন মর্কটের মতো চেহারা। আমি তখনই বলেছিলুম, চোরচোট্টার মতো চেহারা।

মুকুন্দ বললে, বা রে! আপনিই তো বললেন, ‘সাইকেলটা গোয়ালের পাশে রাখ। এখন আর কুকুরের ঘরে তুলতে হবে না।

আরে গাধা, সেটা তো আমার সাইকেল।

আমি তো সেই সাইকেলটার কথাই বলছি।

জজসায়েবের সাইকেলটা কোথায় পাচার করে দিয়ে এলি! ব্যাটা চোর।

কী আশ্চর্য! জজসায়েবের সাইকেলের আমি কী জানি?

বড়মামা অফিসারকে বললেন, লাগান, লাগান, থার্ড ডিগ্রি লাগান। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।

পুলিশ অফিসার বললেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না। ওটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। হাতের কাজটা আগে ঝট করে সেরে নিই। তারপর পেটে স্ক্রু চালালেই সব বেরিয়ে আসবে।

মেজমামা পাইপ, চিবোতে চিবোতে বললেন, কত বছর চাকরি হল আপনাদের?

মুখে ক্ষীরকদম্ব, অফিসার জবাব দিলেন, তা ধরুন, দশ-বারো বছর তো হবেই।

কিস্যু হয়নি। একেবারেই নভিশ। কোনও অভিজ্ঞতাই হয়নি। কোনওদিন শুনেছেন, কোনওদিন দেখেছেন, চোর চুরি করে পুলিশ অফিসারকে খাবার পরিবেশন করছে?

মুকুন্দ বলতে হবে সাহসী ছেলে। সে অমনি ফট করে বললে, আমি বড়দার সাইকেলে চেপে গেলুম। সইটই করিয়ে সেই সাইকেলে চেপেই ফিরে এলুম তক্ষুনি। আমি জজসায়েবের সাইকেল চুরি করব কী করে? গরিব মানুষ বলে যা খুশি তাই বলবেন! আমি তিন বছর এই বাড়িতে চাকরি করছি, একটা জিনিস চুরি গেছে! আমি চোর!

মেজমামা বললেন, স্টপ। আমি ওই পয়েন্টে আসছি। তার আগে আর একটা পয়েন্ট। একজন মানুষ একসঙ্গে কটা সাইকেল চালাতে পারে?

অফিসার মুচমুচ করে নিমকি খেতে খেতে বললেন, একটা।

তা হলে দুটা সাইকেলের প্রশ্ন আসে কী করে! নেকস্ট পয়েন্ট, ও যে সাইকেলটা নিয়েছে, কে দেখেছে! সাক্ষী কোথায়?

অফিসার কোলের ওপর থেকে নিমকির টুকরো মুখে পুরতে পুরতে বললেন, জাস্ট সন্দেহ।

আমি মুকুন্দর হয়ে জজসায়েবের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করব। ডবল মানহানি। এক, বড়দার মানহানি হয়েছে। দুই, মুকুন্দর।

মেজমামা চেয়ার থেকে উঠে সোজা এগিয়ে গেলেন ফোনের দিকে।

অফিসার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কাকে ফোন করছেন?

পার্থকে।

আপনি নাম ধরে ডাকেন?

আমার ক্লাস ফ্রেন্ড।

মেজমামা ঘড়ি দেখলেন। নিজের মনেই বললেন, ওকে এখন কোর্টেই পাব।

মেজমামা ডায়াল করতে লাগলেন। অফিসার দু'জন পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন।

মেজমামা দু'বারের চেষ্টায় লাইন পেয়ে গেলেন। মেজমামা, বলছেন, হ্যালো পার্থ, সকালে তোমার সাইকেল চুরি গেছে? আচ্ছা! তুমি আমাদের সন্দেহ করে থানায় ফোন করেছিলে? করেনি। কে করেছে? তোমার বউ! তিনি তো দুই পুলিশ অফিসারকে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন হামলা করতে। অ, তুমি কিছুই জানো না। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা তো বড় বিপজ্জনক। এরপর ধরো এক রাতে তোমার বউয়ের নেকলেস চুরি হল, আর সেই রাতে তোমার বাড়ি

থেকে আমরা আড্ডা মেরে ফিরে এলুম, পরের দিন পুলিশ এসে আমাদের কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। বাঃ ভাই বাঃ, জজসায়েব বলে, ক্ষমতা আছে বলে, যা খুশি তাই করবে। ছিঃ ছিঃ, কী অপমান। বেলা বারোটা, বড়দা এখনও চেম্বারে যেতে পারেনি, ধরে বসিয়ে রেখেছে। জেরা চলছে। জেরা। কী অপমান। ফোনটা দেব? কাকে? অফিসারকে?

মেজমামা ইশারা করলেন। বড় অফিসার চায়ের কাপ ফেলে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, "এঃ, বিশ্রীভাবে ফাঁসিয়ে দিলেন।" জজসায়েব বোধহয় ওপাশ থেকে খুব ধাতালেন। তিনি অনর্গল হ্যাঁ সার, ইয়েস সার করে কুজো হয়ে ফিরে এলেন। এসেই টুপি আর ব্যাটনটা সোফা থেকে তুলে নিয়ে, অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বললেন, "বলুন কীভাবে ক্ষমা চাইতে হবে!"

মেজমামা নতুন করে পাইপ ধরাতে ধরাতে বললেন, কেন জজসায়েব বললেন বুঝি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, এমন ধাতানি জীবনে খাইনি। আপনি যা করলেন না?

ক্ষমা চাইবার আগে চা-টা শেষ করে নিন। মুখের চা।

অফিসার দু'জন একচুমুকে সব চা শেষ করে, গ্যাটম্যাট করে বেরিয়ে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে খেল শুরু হল মুকুন্দর। সে গম্ভীর গলায় বললে, "বড়দা, মেজদা, আমি এখনই চলে যাব। আমি চোর, আমি মর্কট। আমি কালো, আমি বেঁটে। আমার মাথায় মোটা মোটা চুল।"

মেজমামা বললেন, এইবার ঠেলা সামলাও বড়দা। তুমি যখন বলতে শুরু করো, তখন তো সহজে থামতে চাও না।

শোনো, আমি একটা সত্যি কথা বলব। সত্যি কথা বলতে আমার লজ্জা করে না। পুলিশ দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। আমার হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল। সেই কারণে আমি একটা-দুটা মিথ্যে কথাও বলে ফেলেছি। তোমরা লক্ষ করেছ?

অবশ্যই করেছি। সবেতেই তুমি না বলছিলে।

তোরা দেখলি, পুলিশ দেখলেই নিজেকে কীরকম চোর চোর মনে হয়! সব মানুষের ভেতরেই একটা চোর থাকে, তাই না?

শোনো, তোমার গবেষণা এখন রাখো। গণধোলাই যদি খেতে না চাও, সোজা ডাক্তারখানায় চলে যাও। আর মুকুন্দর কাছে তুমি-ক্ষমা চেয়ে নাও। সত্যিই, তুমি ছেলেটাকে একেবারে বাঘের মুখে ঠেলে দিচ্ছিলে। কোথায় তুমি ওকে আগলাবে, বিপদ থেকে বাচাবে, তা না করে...।

যাক ভাই, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। এটা কিন্তু আমার ঠিক চরিত্র নয়। আমি ঘাবড়ে গিয়ে করে ফেলেছি। মুকুন্দ, তুই আমাকে ক্ষমা করে দে। পুলিশ না হয়ে বাঘ হলে দেখতিস আমার স্বরূপ। বাঘা যতীনের মতো লড়াই করতুম।

বড়মামা বললেন, ধুর, ব্যাটা। যত আধুনিক বাংলা গানের লাইন ঝাড়ছিস। অরিজিনাল কিছু ছাড়।

তিন

মেজমামার একটা রকিং-চেয়ার আছে। আমাদের বাড়ি থেকে এই মাইলখানেক দূরে গঙ্গা। সেখানে যত বাগানবাড়ি। সুন্দর সুন্দর বাড়ি। একসময় সুন্দরই ছিল। এখন সব ভেঙে ভেঙে ভূতের মতো চেহারা হয়েছে। মানুষের হাতে আর একদম পয়সা নেই। বড়মামা বলেন, "পয়সা থাকবে কী করে! বড়লোকেরা তো আর রোজগার করতে জানে না। তারা শুধু খরচটাই শিখেছে।" বড়মামা এই গঙ্গার ধারেই এমন বড়লোক দেখেছেন, রোজ দশ-বারো হাজার টাকা খরচ করতে না পারলে, যার ভীষণ মন খারাপ হত। তার মা অমনি মাথার কাছে বসে চুলে হাত বোলাতে বোলাতে ছেলেকে বোঝাতেন, মন খারাপ করিসনি বাবা! আজ কোনও কারণে পারিসনি, কাল ঠিক পারবি।' নায়েব পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে বলতেন, 'হুজুর দোষটা আমারই। আমি যদি একজন নাচিয়ে না এনে এক জোড়া আনতুম তা হলে দশ ছাড়িয়ে যেত। আমি কথা দিচ্ছি হুজুর, কাল হেসে-খেলে আমি পনেরো পার করিয়ে দেব। কাল আমি সব খাবার পেলেটি থেকে আনাব।'

হতাশ হুজুর অমনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, 'একা আমি আর কত টানব! আমার নিজের পেটটা তো জালার মতো হয়ে গেল! কোনওদিক থেকে কোনও কো-অপারেশান নেই। এইভাবে চললে কবে শেষ হবে! আর কতদিন বড়লোক থাকা যায়! সবকিছুর তো একটা লিমিট আছে। শেষ আছে! পিতাপ্রপিতামহের আমল থেকে, এ যেন চলছে তো চলছেই। আর পারা যায়!'

নায়েব বললেন, ‘কিছু দানধ্যান করে দিন না হুজুর।’ হুজুর বললেন, ‘পাগল হয়েছেন। গরিবদের অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে না! মানুষের অভ্যাস খারাপ করতে আছে। কারও নিজের পা কেটে নিয়ে নকল পা লাগালে তার হাটা-চলা ঠিক থাকবে? কী যে সব শাস্ত্রবিরোধী কথা বলেন আপনি? নিজের কাজ নিজেকেই করতে হবে। অন্যের সাহায্য নেবেন কেন আপনি? এ তো আমার দায়! আমার কর্মফলের বোঝা আমাকেই বইতে হবে। উঠে-পড়ে লাগুন, উঠে-পড়ে লাগুন।”

বড়মামা বলেন, “তখন কী সুন্দর কালই না ছিল। বিশাল এক আয়রনচেস্ট ঘরের একপাশে। ইয়া বড় এক হাতল লাগানো। এক-এক জমিদারের সিন্দুকের হাতলে এক-এক রকমের মুখ ঢালাই করা থাকত। বিলেতের ‘চাবস’ কোম্পানি এইসব সিন্দুক তৈরি করতেন। বিশাল হাতির পিঠে চাপিয়ে এইসব সিন্দুক আনা হত। হাতির চেয়েও সিন্দুক ভারী। হাতির চারটে পা নাকি থরথর করে কাঁপত এক মাইল যাবার পরই চারজন লোক হাতির চারটে পায়ে রসুনতেল মালিশ করত। তা না করলে হাতি আর এক পা-ও হাঁটবে না। হাতির সঙ্গে সঙ্গে আসছে ‘চাবস’ কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার, মিস্ত্রি, কুলি আর ডাক্তার। ইঞ্জিনিয়ার আর ডাক্তার দু’জনেই লালমুখো সায়েব। মুখে সব ডাংগুলির মতো চুরোট। রেলের ইঞ্জিনের মতো ভসভস ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পিড়িং পিড়িং ইংরেজি বলতে বলতে আসছে। এখন যেমন প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্যে রাস্তার দু’পাশে ভিড় জমে যায়, সেকালে সেইরকম জমিদার বাড়ির সিন্দুক দেখার জন্যে ভিড় জমে যেত। সব গাছের ডালে উঠে পড়েছে। বাড়ির চালে উঠে পড়েছে সব। একী রে বাবা! ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা যেন। মাইলে মাইলে হাতির

পায়ে তৈল-সেবা। আর সায়েব ডাক্তার স্টেথিস্কোপ দিয়ে হাতির হার্ট পরীক্ষা করছেন। হাতির হৃদয় তো বিশাল বড়। গোটা বুকটাই হৃদয়। হাতির হার্ট পরীক্ষারও একটা কায়দা ছিল। সে স্টেথিস্কোপও তেমনই বিশাল। কানে দেবার নল দুটো বিশ-তিরিশ ফুট লম্বা। আর বুকে লাগাবার চাকতিটা ঠিক চাটুর মতো। তেমনি তার ওজন। হাতির পেটের তলায় ঝোলায় বেঁধে একজন কুলিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। সে মোটর মেকানিকের মতো পেটের তলায় চিত হয়ে ঝুলে ঝুলে চাটুর মতো চাকতিটা বুকে ঠেকাত, আর বিশ ফুট দূরে টুলে বসে কানে নল লাগিয়ে সায়েব ডাক্তার হৃদয়ের শব্দ শুনতেন। তিনি যেন জাহাজ চালাচ্ছেন। থেকে থেকে বলছেন, 'থার্টি ডিগ্রি নর্থ, ফিফটিন ডিগ্রি সাউথ। প্রায় একঘণ্টা লেগে যেত হাতির হার্ট পরীক্ষা করতে। হার্টের আবার সেইরকম শব্দ। যেন তালে তালে জয়ঢাক বাজছে। সায়েব ডাক্তার হার্ট পরীক্ষার পর ঝাড়া আধ ঘণ্টা আর কোনও কথা শুনতে পেতেন না। একেবারে কালা। বড়মামা গল্প করেন, 'সাতক্ষীরের ছোট তরফের জমিদারের সিন্দুক আনার সময় হাতির হার্টের শব্দে ডাক্তারই হার্টফেল করেছিলেন। একেবারে নতুন ডাক্তার, সবে দেশ থেকে এসেছেন। দু-একটা কুকুর টুকুরের হার্ট দেখে হাতেখড়ি। হাতির হার্ট সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। আচমকা ধাই করে কানের ভেতর দিয়ে ঝেড়ে দিয়েছে তোপ। নল কানে দিয়ে যতটা দূরে বসা উচিত ছিল, ততটা দূরে বসেননি। সায়েবরাও বোকা হয়। কত সায়েব আছে অঙ্কে আমার মতো কেঁদেকক্কে পঞ্চাশ প্রায়। সংস্কৃতে শূন্য।'

আমার বড়মামার কাছে শোনা এইসব কাহিনি। গল্প নয়। আমি একবার গল্প বলেছিলুম বলে, বড়মামা অসম্ভব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। গল্প আবার কী?

এসব সত্য ঘটনা। কাহিনি। এক-এক জমিদার চাবস কোম্পানিকে সিন্দুক অর্ডার দেবার সময় বলে দিতেন হাতলে কীসের মুখ ঢালাই করা হবে। সিংহ, বাঘ, মকর, সাপ, কুকুর, মড়ার মাথা, ভৈরবী, মা কালী, শিব, দুর্গা। সায়েব কোম্পানি হলে কী হবে। যা বলবে, যা ছবি সাপ্লাই করবে সব ঢালাই করে দেবে সুন্দর করে। এক-একটা সিন্দুক একেবারে মাপ মতো লোহা গলিয়ে ছাঁচে ফেলে ঢালাই করা। এই তার পুরু চাদর। হাতির পিঠ থেকে কপিকলে করে নামিয়ে পঞ্চাশজন লোক গলদঘর্ম হয়ে খাজাঞ্চিখানায় এনে সেট করে দিয়ে যেত। আনার সময় তিন-চারজন এমন আহত হত যে, একমাস বিছানায় পড়ে থাকত। কেউ কেউ চিরকালের মতো পঙ্গু হয়ে যেত। যারা পঙ্গু হয়ে যেত বিলিতি কোম্পানি তাদের সারা জীবন পাঁচ সিক্কা হারে ভাতা দিত। ইট, সিমেন্ট আর সুরকি-বালি দিয়ে বেদি তৈরী করে সিন্দুকটাকে এমনভাবে বসানো হত, যে হাজারটা লোক শত চেষ্টা করেও সিন্দুকটাকে সরাতে পারত না। বিলিতি তালা চাবি খুলে হাতলটাকে পড়পড় করে পনেরোবার ঘোরালে তবেই সিন্দুকের দরজা খুলত। ভেতরে একেবারে তেলা সলিড লোহার সব খুপরি হিরে রাখো, জহরত রাখো। থরে থরে নোট সাজিয়ে রাখো। মোহর রাখো তিন মন, চার মন, কয়েন রাখো। দলিল সাজিয়ে রাখার আলাদা ব্যবস্থা। জমিদারি মানে সিন্দুক। সিন্দুক দেখে জমিদার বড় কি ছোট বোঝা যেত।

খাজাঞ্চিখানার চেহারা হত গুমঘরের মতো। ছোট ছোট পাতলা পাতলা ইট দিয়ে বাড়ি তৈরি হত সেকালে। এই মোটা মোটা সব দেওয়াল। এত মোটা যে দেওয়ালের মধ্যে জ্যান্ত মানুষ ঢুকিয়ে, দেওয়াল আবার গেথে প্লাস্টার করে দিলে বোঝার ক্ষমতা থাকত না তার ভেতরে একটা মানুষ আছে। ধীরে ধীরে

পরিণত হচ্ছে কঙ্কালে। সেই দেওয়ালেই হয়তো মা কালীর ছবি ঝুলছে। কি কোনও সায়েব শিল্পীর আঁকা পুরনো কলকাতার দৃশ্য। খাজাঞ্চিখানায় কোনও জানলা থাকত না। নোনা-ধরা দেওয়াল। ঝুল তো থাকবেই। দেওয়াল ঘেঁষে খুব নিচু লম্বা লম্বা চৌকি। প্রজারা সব এসে সারবেঁধে পাশাপাশি বসবে। প্রজারাই তো জমিদারের সরষে। যত রগড়াবে, তত তেল বেরোবে। পাটিপাতা উচু চৌকির ওপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন নায়েবমশাই। পরনে ধুতি আর বেনিয়ান। সে বেশ মজার জামা। ফতুয়ার মতোই। পাশে ফিতে বাঁধা। যেন ফাইলকভার। নায়েবমশাইয়ের সামনে একটা ডেস্ক। দোয়াত, কলম। ব্লটিং। খেরোর খাতা। টিপসই দেওয়ার কালি। মাথার ওপর ঝুলছে টানা পাখা। দড়িটা চলে গেছে বাইরের বারান্দায়। সেখানে দরজার পাশে জড়সড় হয়ে বসে একটা লোক ক্রমান্বয়ে দড়ি টেনে চলেছে। ঝালর লাগানো পাখার বাতাস একমাত্র নায়েবমশাই আর গোমস্তাদের গায়েই লাগছে। যারা পাখা টানত তাদের সায়েবরা বলত, পাঙ্খা পুলার আর খাজাঞ্চিরা বলতেন, “পাখাবরদার”। পাখাবরদাররা এক গুলি আফিং খেয়ে পাখা টানতে বসত। কাজটা এত একঘেয়ে, যে তা না হলে পারা যেত না। লোকটির ঘোর লেগে যেত। মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়লে হাত বন্ধ হয়ে যেত। পাখা থেমে আসত। নায়েবমশাই অমনি ভরাট মেঘের মতো গলায় বলে উঠতেন—ইয়াও উল্লুক’। অমনি পাখা আবার জোরে জোরে দুলে উঠত। নায়েবমশাইদের প্রিয় গালাগাল ছিল, উল্লুক, মর্কট আর শয়তানের বাচ্চা। নায়েবমশাইদের বিচারে মানুষের জাত ছিল মাত্র দুটি, হুজুরের জাত আর উল্লুকের জাত। নায়েবমশাইয়ের পেছনে সেই সিন্দুক। দরজার লতাপাতার নকশা। নায়েবমশাইয়ের বা পাশে একটা ছোট ঘর। সেই ঘরটাকে বলা হত

রগড়ানির ঘর। কৃপণ প্রজা, যারা জমিদারমশাইয়ের সেবায় টাকা-পয়সা ছাড়ার ব্যাপারে লেজে খেলত, তাদের ওই ঘরে নিয়ে গিয়ে স্বভাব সংশোধন করা হত। সামান্য দু-একটা দাওয়াই। মেঝেতে চিত করে ফেলে বুকে বাঁশডলা। একে বলা হত বাটনা বাটা। আর একটা দাওয়াইয়ের নাম ছিল, কীচক বধ। দু'জনে দুটা পা ধরে দু'পাশে ফেঁড়ে ফেলার চেষ্টা করত। রোগীর সঙ্গে রোগীর মতোই ব্যবহার করা হত। দাঁড় করিয়ে রেখে বা বসিয়ে রেখে কষ্ট দেওয়া হত না। মেঝেতে সুন্দর করে শুইয়ে চিকিৎসা করা হত। জল চাইলে জল দেওয়া হত। জমিদারদের যত সব নিষ্ঠুরতার কথা সাতকাহন করে বলা হয়, দয়ালুতার কথা বলা হয় কই! একালের পুলিশ-লকআপে চরিত্র-সংশোধনের সময় জল দেওয়ার কোনও রেওয়াজই নেই। সে যেন জল ছাড়াই রোগারোগ্যের ক্যাপসুল গেলানো।

বড়মামার স্পষ্ট সব মনে আছে। সকালবেলা নায়েবমশাই এসে সেরেস্তায় বসলেন। দেওয়ালের চুনবালি খসে খসে, কোথাও ফুটে উঠেছে রাক্ষসের মুখ। কোথাও বাঘের মুখ। নিচু চৌকিতে সারি দিয়ে বসে আছে উল্লুকেরা'। প্রত্যেকেরই ট্যাকে কিছু না কিছু আছে। নায়েবমশাই প্রথমেই একটা ঢেঁকুর তুলবেন, যেন সৌদামিনীর গোয়ালে সন্ধ্যার বাছুর ডেকে উঠল। তিনি এদিকওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছেন; সবাই একটু সচকিত হবেন। নায়েবমশাই হঠাৎ আসফাকুলকে দেখতে পেয়ে বলে উঠবেন, "কী রে ব্যাটা দেখতে পাচ্ছিস না, পেট গরম হয়েছে। তোর কোনও কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান নেই।"

এজ্ঞে?

এজ্ঞে ! ব্যাটা ভোঁদড়! যা এক কাদি নেয়াপাতি ডাব পেড়ে আন। হ্যাঁরে, তোরা কি কোনওকালে মানুষ হবি না! চিরটাকাল উল্লুকই থেকে যাবি! আমি

তোদের মা-বাপ। স্বীকার করিস তো! একথা অস্বীকার করিস, না স্বীকার করিস! কে, কে, কোন ব্যাটা অস্বীকার করলে?

এজ্ঞে, কেউ তো করেনি।

তাই বলো। অস্বীকার তোরা করতে পারিস। তোদের দ্বারা সবই সম্ভব। তোরা দিনকে রাত করতে পারিস। আমাদের শাস্ত্র কী বলছেন জানিস, মানুষ অকৃতজ্ঞ জেনেও তাদের মঙ্গলের জন্যে জীবন উচ্ছন্নে দেবে। তোরা কত বড় অকৃতজ্ঞ দেখ, তোরা কেউ ডাবের কথা বললি না, আমাকে বলতে হল! পেট গরম হলে কী করতে হয়? যদুগোপাল? তুমি বলো?

আজ্ঞে উপবাস। ক্ষণে ক্ষণে জলপান আর তলপেটে ভিজে গামছা লেপন।

প্রভু শ্রীহরি। কী হাতে আমাকে সমর্পণ করলে প্রভু! এ যে দেখি শৃগালের চেয়েও ধূর্ত। তবু বললে না পাঁচ পোয়া দই আমার দোকান থেকে এনে দিচ্ছি নায়েবমশাই। শোনো গোপাল, শাস্ত্র বলেছেন, শঠেশাঠ্যং যা পাঁচ পোয়া পয়োধিতে হত, এখন আর হবে না মানিক। সের খানেক ছানারও প্রয়োজন। যাও বসে বসে গোঁফ না চুমরে গাত্রোৎপাটন করো।

নায়েবমশাই এদিক-ওদিক তাকালেন, এই যে শ্রীল শ্রীযুক্ত মঙ্গল হালদার, বেশ ঘাপটি মেরে বসে আছিস তো! উ আবার নতুন লুঙ্গি পরা হয়েছে! দিনকাল তা হলে ভালই যাচ্ছে! সকালে জালে গিয়েছিলে?

আজ্ঞে।

আজ্ঞে তা জানো না পেট গরম হলে কচিপাঠা নাস্তি! কোবরেজি বিধান হল, পেঁপে, কাঁচকলা, ডুমুর, থানকুনি পাতা সহ কুর্চিবাটার ঝোল। কাঁচালঙ্কা চলবে না। মরিচের ঝাল চলতে পারে। মরিচ পেট ঠান্ডা করে। বিকল্পে

লাউচিংড়ি। তোমরা সব রয়েছ, এখন তোমরাই বলো দিবা-দ্বিপ্রহরে আমি কী সেবন করব! আমি নিজে থেকে কিছু বলব না। যোগ্য সন্তানেরা থাকতে পিতার কিছু বলা সাজে না।

জমিদারি এক মজার ব্যাবসা। নায়েব আর প্রজায় কথায় কথায় বেলা বাড়ে। এদিকের সিন্দুকের হাতল ঘুরতে থাকে। ওদিকে দাওয়া ভরে ওঠে, ডাব রে, তাল রে, পেপে রে। মাছ আসে। আসে কচি পাঁঠা। গোবিন্দভোগ। দলিল বন্ধক পড়ে। ভিটে লাটে ওঠে। আর যিনি জমিদারমশাই, তিনি তখনও মখমলের বিছানায়। সিল্কের লুঙ্গি। নাসিকাগর্জন। রাতে সাধনভজন করেন, তাই নিদ্রাভঙ্গে বিলম্ব। তাই কথায় আছে, নায়েব জাগেন দিনে, জমিদার জাগেন রাতে।

আবার বড়মামা এইসব এত সুন্দর করে বলেন। বড়মামাদেরও সিন্দুক ছিল। সেই সিন্দুকের হাতলে ছিল মকরের মাথা। সে এত সুন্দর কাজ, বিশ্বাসই হয় না বিলেতে তৈরি। সেই সিন্দুক গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। সাতচল্লিশ সালের ১৫ আগস্ট। সিন্দুক বিসর্জন দিয়ে স্বাধীনতাকে স্বাগত জানানো হয়। আমার বড়মামাদের ফ্যামিলির নিয়ম হল, কোনও-কিছু বিক্রি করা চলবে না। হয় দিয়ে দাও, না হয় ফেলে দাও। সিন্দুকটা দান করে দিতে চেয়েছিলেন, কেউ নেয়নি। জমিদারির বেশিরভাগটাই দখল হয়ে গেছে। কিছু সরকার নিয়েছেন, কিছু নিয়েছেন উদ্বাস্তুরা। বড়মামার কাছে এখনও দলিলের পাঁজা আছে। সে যে কত ! পার্টিশান তৈরি করা যায়।

গঙ্গার ধারের এক জমিদারের বাগানবাড়ি এক সায়েব কিনেছিলেন। সেই সায়েবের নাম ছিল টবিন টবিনসায়েব সায়েব হলেও খুব ফ্রেন্ডলি ছিলেন। সাংঘাতিক ভাল ফুটবল খেলতেন। টবিনসায়েবের গল্প শুনতে হলে মেজমামাকে

ধরতে হবে। বয়েসের অনেক পার্থক্য থাকলেও টবিনসায়েব মেজমামার বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। মেজমামার ফুটবলে খুব ঝোঁক ছিল। টবিনসায়েব বাড়ির মাঠে মেজমামাকে ফুটবল শেখাতেন। পাস, ড্রিবল, ডজিং। মেজমামার দিন তো টবিনসায়েবের বাগানেই কাটত। সায়েব টেনিস খেলা শিখিয়েছিলেন। বিলিতি দাবা। ব্রিজ। আবার মেজমামাকে সাংঘাতিক ভাল ইংরিজিও শিখিয়ে গেছেন। রান্না শিখিয়েছেন স্ট্যু, সুপ, ফ্রাই। টবিনসায়েবের গল্প বলতে বলতে মেজমামার চোখ ভিজেভিজে হয়ে যায়। তখন বড়মামা দুঃখের সঙ্গে লড়াই করছেন। ছোলা আর ছাতু খেয়ে আর ব্যায়াম করে মেজমামার তখন রাজপুত্রের মতো চেহারা হয়েছে। চেহারা দেখলে কে বলবে, মেজমামার স্কুলের মাইনে আসে ঘুটে বেচা পয়সা থেকে। সেইসময় মেজমামার সঙ্গে সায়েবের পরিচয় স্কুলের ফুটবল গ্রাউন্ডে। সায়েবের আর কেউ ছিল না। মেমসায়েব বিলেতে চলে গেছেন। ইংরেজ মেয়ের সহ্য হয়নি ভারতের স্বাধীনতা। মেজমামাকে সায়েব নিজের ছেলের মতোই ভালবেসে ফেললেন। সায়েবের বাগানেই মেজমামার দিন কাটত। একদিন মেজমামা পেটের ব্যথায় ধনুক হয়ে গেলেন। টবিনসায়েব সঙ্গে সঙ্গে নিজের গাড়িতে করে নিয়ে গেলেন মেডিকেল কলেজে। অ্যাপেনডিক্স। সঙ্গে সঙ্গে অপারেশান করতে হবে, নয়তো ফেটে যাবে। অ্যাপেনডিক্স অপারেশান তখনও মেজর অপারেশান। সায়েব মেজমামাকে কেবিনে রেখে, সারারাত অপারেশান থিয়েটারের বাইরে বসে প্রার্থনা করে, ভোরে বাড়ি ফিরলেন। বড়মামা টাকার কথা তুলেছিলেন। সায়েব বলেছিলেন, “হি ইজ মাই সান। পৃথিবীতে টাকাটাই সব নয়।”

সায়েব ভারতে আর থাকতে পারলেন না। যাবার আগে মেজমামাকে তাঁর লাইব্রেরি, রকিং চেয়ার, বিলিতি রাইটিং ডেস্ক, কলম, ঘড়ি, মাছধরার সরঞ্জাম, সব দিয়ে গেছেন। মেজমামা সেই চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছেন। কখনও পড়ছেন। কখনও একটু একটু ঘুমিয়ে পড়ছেন। ডাক্তারখানা থেকে বড়মামার ফিরতে দেরি হচ্ছে। দেরিতে গেলে যা হয়। নিমন্ত্রিত শরৎবাবু বড়মামা না এলে বসবেন না। আমরা তো বসবই না। শরৎবাবু শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছিলেন। এখন তিনি কাগজ চাপা পড়ে আছেন। মাঝারি ধরনের নাক ডাকছে। মন্দ লাগছে না। মেজমামার দোলদোল চেয়ার দুলছে। ওই চেয়ারে বসে যত দোলা যায় ততই ঘুম আসে। মেজমামার চোখদুটো বন্ধ। কোলের ওপর চশমা। ঠোটের কোণে হাসি। মেজমামা বলেন, "আমি চোখ বুজলেই স্বপ্ন দেখি— শেলি, কিটস, বায়রন, শেক্সপিয়ার। লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শেক্সপিয়ারের বাড়ির পাশের লেকে রাজহংস দেখছি।"

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলুম। আমার যখন ভীষণ খিদে পায়, তখন আমি টিনটিন পড়ি। হঠাৎ মনে হল, মেজমামা পেছনদিকে উড়ে গেলেন যেন। স্বপ্ন দেখছি না তো! না, আমি কেন স্বপ্ন দেখব ! আমি তো জেগেই আছি। ধমাস করে একটা শব্দ হল। মেজমামা চেয়ারের পেছনদিকে মেঝেতে হলাসনের ভঙ্গিতে পড়ে আছেন। খালি চেয়ারটা তিরতির করে দুলছে। মেজমামার পা দুটো বুককেসে গিয়ে লেগেছিল। শরৎবাবুর ঘুম চটে গেছে। তিনি কাগজ চাপা অবস্থায় কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। তিনিও মনে হয় স্বপ্ন দেখছিলেন। কাগজের তলা থেকে চিৎকার করছেন, "হেলপ, হেলপ, টাইগার, টাইগার!"

আমি কাকে হেলপ করব! মেজমামা ৎ-এর মতো হয়ে আছেন। শরৎবাবুর শবাসন।

মেজমামা বললেন, টুক করে আগে আমাকে তুলে দে। চেয়ারটা সরা, তা হলেই আমি সোজা হয়ে যাব।

চেয়ারটাকে সরাতেই মেজমামা উঠে পড়লেন। উঠেই চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে শরৎবাবুকে বললেন, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসুন সার। কাগজের জঙ্গলে, কাগজের বাঘ দেখছেন আপনি।

মেজমামাকে এখন দেখলে কেউ আর বুঝতেই পারবে না, এই মানুষই একটু আগে চেয়ার উলটে পেছনে ডিগবাজি খেয়েছিলেন। মেজমামার শরীর এখনও বেশ ফিট। কাগজের মোড়ক খুলে শরৎবাবুর মুখটা বের করে আনলুম। ঘেমে গেছেন ভদ্রলোক। শরৎবাবুর চোখ দুটো বেশ বড় বড়। ভারী ভালমানুষের মতো দেখতে। বড়মামার ছেলেবেলার বন্ধু। জামালপুরে থাকেন। কলকাতায় ছোট্ট একটা একতলা বাড়ি আছে। বাড়িটা সারাবছর বন্ধই থাকে। জামালপুর থেকে বছরে একবার ছুটিতে এসে যখন দরজা খোলেন, তখন সে যেন এক দেখার মতো দৃশ্য! একেবারে কবিতা, চারপাশে ঝুলের পরদা ঝুলছে। অতি সূক্ষ্ম সুতোয় বোনা ভূতের কাপড়ের মতো। আর সেই ঝুলে জড়িয়ে আছে এক বছরের সঞ্চিত ধুলোর কণিকা। রোদের আলো পড়ে চিকচিক করছে হিরের গুড়োর মতো। শরৎবাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো বড় সাহিত্যিক না হলেও, সাহিত্যে নাম করেছেন। ভূতের গল্প আর ভ্রমণের গল্প ভালই লেখেন। একটু আগে আমাকে দশখানা বই উপহার দিয়েছেন। আর আমি এতবড় একটা ছেলে, আমাকে উপহার দিয়েছেন কিনা, ব্যাটারিচালিত একটা মোটরগাড়ি। সেটাকে

আবার ইচ্ছেমতো দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গাড়িটা নিয়ে নিজেই এতক্ষণ খেলা করছিলেন আপন মনে। বড়মামা বলেন, "শরৎ বড় হলেও শিশু।" বড়মামা, খোকা বলে ডাকেন।

শরৎবাবু উঠে বসে বললেন, শুধু ঘুম নয়, বেশ বিউটিফুল একটা স্বপ্নও দেখে ফেললুম। আমার নেকস্ট বইতে কাজে লাগিয়ে দেব।

মেজমামা বললেন, কী জাতীয় স্বপ্ন?

ডিটেলসে বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে, তবে এইটুকু জেনে রাখুন ওয়াইল্ড লাইফের দিকেই যাবে।

আপনি তো মশাই ঘুমোলেন পনেরো মিনিট আর স্বপ্নটা তা হলে বলতে তো পনেরো মিনিটই লাগা উচিত।

না, না, স্বপ্ন সম্পর্কে আপনার পড়াশোনা আর অভিজ্ঞতা থাকলে এ-কথা বলতেন না। পনেরো মিনিটের স্বপ্ন সারাদিন বলেও হয়তো শেষ করা যাবে না। স্বপ্ন গোটানো থাকে। স্বপ্ন অনেকটা কন্ডেনসড মিল্কের মতো। পনেরো মিনিটের টিনে পনেরো দিনের গল্প থাকতে পারে। মাইক্রোফিলমের মতো। তবে শেষ দৃশ্যে দেখলুম, আপনি আর আমি দু'জনে মাচা ভেঙে দমাস করে পড়ে গেলুম, জাস্ট ইন ফ্রন্ট অব এ রয়াল বেঙ্গল টাইগার। উঃ, সে কী থ্রিল। আর আপনার কী সাহস! আমি ভয়ে চিৎকার করছি, টাইগার, টাইগার, বার্নিং ব্রাইট', আর আপনি খিলখিল করে হাসছেন আর বলছেন—"পেপার টাইগার। ঝাক করে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি আমার মুখের ওপর পড়ে আছে একটা খবরের কাগজ।"

মেজমামা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। আড়ামোড়া ভেঙে বললেন, "আমি একবার সাইকেলটা নিয়ে বেরোই। দেখি বড়দার কী অবস্থা! আর এক প্যাকেট

টোবাকো কিনে আনি। স্টক ফুরিয়ে এসেছে।” আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “যাবে নাকি?”

চলুন যাই।

গোয়ালের পাশে বেড়ার গায়ে সাইকেলটা ঠেসানো রয়েছে। মেজমামা আর আমি সেইদিকে এগিয়ে চললুম। দিনটা ভারী সুন্দর হয়ে উঠেছে। মোমপালিশ করা নীল আকাশ। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে সাদা মেঘের ভেলা। দুর্গাপুজো এসে গেল। কী ভাল লাগে এই সময়টা। সবুজের ফোয়ারা ছুটছে। বিশাল একটা ডাশা ভোমরা ভোঁ-ভোঁ করে উড়ছে। চকোলেটের যেন ডানা গজিয়েছে। বড়মামার বেতের ঝোপটা একেবারে ফাটাফাটি দেখতে হয়েছে।

সাইকেলটার সামনে এসে মেজমামা বললেন, এ কী? এটা কার সাইকেল। এ তো আমাদের সাইকেল নয়! আমাদের সাইকেল তো এত নতুন ছিল না। এ তো অন্য কোম্পানির, অন্য মডেলের।

মেজমামা চিৎকার করে মুকুন্দকে ডাকলেন। মুকুন্দ সবে চান করে চুলের কেয়ারি করছিল। সেই অবস্থায় বেরিয়ে এল। ডোরাকাটা একটা হাফপ্যান্ট পরে। মাথার চারপাশ দিয়ে তেলজল গড়াচ্ছে।

মেজমামা বললেন, এটা কার সাইকেল মুকুন্দ?

ভাল করে দেখো।

এ সাইকেল আমাদের নয়। অসম্ভব। এ একেবারে অন্য জাতের সাইকেল। এর গায়ের রং আলাদা। এর চেহারা আলাদা।

কোথা থেকে তুমি পেলে এটাকে?

মুকুন্দ বললে, মেজদা, আমার কী মনে হচ্ছে বলব! আমি যখন জজসায়েবের বাড়িতে গেলুম, তখন মনে হচ্ছে বারান্দায় একটা সাইকেল ছিল। আমার যেন মনে হচ্ছে, আমার সাইকেলটা আমি পাশে রেখে, ভেতরে গেলুম। সার্টিফিকেটটা নিলুম। বাইরে এলুম। সাইকেলটা নিলুম। রাস্তায় নামলুম। সাইকেলে চাপলুম। গড়গড় করে চলে এলুম বাড়ি। এইবার কী হল বলুন তো!

মেজমামা কেমন যেন হয়ে গেলেন। মাথাটাকে ঝাঁকিয়ে নিয়ে বললেন, কী হল! আমার তো মনে হল ছোট সাইজের একটা বাঘ বেরিয়েছিল। এলুম, খেলুম, হালুম, হুলুম।

আপনি একটু বসুন এই জায়গাটায়, আমি আপনাকে অঙ্কটা বুঝিয়ে দিই। এর মধ্যে অল্প একটু অঙ্ক আছে।

গোরুর বিচুলি কাটার জন্যে ওই জায়গায় বেশ বড় একটা পাথর রয়েছে। মেজমামা সেই পাথরটার ওপর বসলেন। আমার তো মনে হচ্ছে বড়মামার ডান হাত মুকুন্দ এখনই একটা গোয়েন্দা কাহিনি শোনাবে। মেজমামা বেশ গুছিয়ে বসলেন। মেজমামার এই গুণটা আছে, যখন যেখানেই বসুন, বেশ সুন্দর করে জমিয়ে বসতে পারেন। বসেই দু-তিনবার নাক ফোস ফোস করে বললেন, “গোয়ালের ধারে বেশ একটা গ্রাম গ্রাম গন্ধ থাকে, তাই না! শুকলেই মনে হয় স্বাস্থ্য ভাল হয়ে যাচ্ছে। হ্যা বল, এইবার অঙ্কটা বল।

মুকুন্দ মেজমামার পায়ের কাছে বসে পাশ থেকে একটা খোলামকুচি তুলে নিল, মেজদা, ছবি না আঁকলে আপনি বুঝতে পারবেন না।

মেজমামা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। মুকুন্দ পায়ের কাছের জমিতে ছবি আঁকতে লাগল। আঁকছে আর বোঝাচ্ছে, ধরুন, এই হল জজসায়েবের

বারান্দা। আর এই হল একটা সাইকেল। আমি গিয়ে আমার সাইকেলটা এই সাইকেলটার পাশে রাখলুম।

আমি আর মেজমামা দু'জনেই দেখছি। আহা, মুকুন্দর কী আঁকার ছিরি। লম্বা একটা রেখা টেনেছে, তার ওপর মেরেছে দুটো ঢেরা।

মেজমামা বললেন, তারপর?

"আমি এই ডান পাশের খোলা দরজা দিয়ে, ঘরের ভেতর চলে গেলুম।" মুকুন্দ ডান পাশে ফাঁক ফাঁক দুটো রেখা টানল। সেই রেখা দুটো হল দরজা।

মেজমামা বললেন, তারপর?

আমি যখন ঘরের ভেতরে, জজসায়েবের সঙ্গে কথা বলছি, তখন কেউ এসে একটা সাইকেল নিয়ে চলে গেল। তার মানে এই দুটো সাইকেলের একটা হাওয়া হয়ে গেল।

মুকুন্দ একটা ঢেরা মুছে দিল।

মেজমামা বললেন, তারপর?

"আমি সার্টিফিকেট নিয়ে আনন্দে লাফাতে লাফাতে বাইরে এসে এই সাইকেলটা নিয়ে একলাফে চেপে বসে সোজা বাড়ি।" মুকুন্দ ঢেরাটা মুছে দিল।

মেজমামা জিজ্ঞেস করলেন, কীসের এত আনন্দ?

বা রে! আমি যে কম্পাউন্ডার হব।

কম্পাউন্ডার হবি। কে তোকে কম্পাউন্ডার করবে?

বড়দা। আমার বড়দা। বড়দা ছাড়া আমার কে আছে!

উঃ দেশের কী দুর্দিন। তুই হবি কম্পাউন্ডার! তোর ওই শাবলের মতো হাত আর চিমটের মতো আঙুল নিয়ে ইঞ্জেকশান দিবি? তুই ইংরেজি পড়তে জানিস, মুকুন্দ?

আমাকে আন্ডার এস্টিমেট করবেন না মেজদা।

মেজমামা চমকে উঠে বললেন, অ্যাঁ, তুই আন্ডার এস্টিমেট বলতে পারলি। সত্যিই তোকে আমি আন্ডার এস্টিমেট করেছিলুম।

মুকুন্দ বললে, ছেড়ে দিন। ওটা হল গিয়ে সাইড ইস্যু।

মেজমামার হাতে-ধরা পাইপটা টপ করে পায়ের কাছে পড়ে গেল। অবাক হয়ে তাকালেন মুকুন্দর দিকে। মেজমামার মুখের চেহারা পালটে গেছে। কেউ ভাল লেখাপড়া করলে, মেজমামা তাকে ভীষণ ভালবাসেন। তারজন্যে সবকিছু করতে পারেন।

মুকুন্দ বললে, কিছু মনে করবেন না মেজদা, আপনার মধ্যে এখনও বেশ জমিদারি অহংকার আছে। সব মানুষকেই আপনি আগে থেকে বিচার করে ফেলেন।

তোর মাথা! আমাকে বড়দা বাতের তেল আর ঘুটে-বেচা পয়সায় মানুষ করেছেন। আমি ছোলা আর ছাতু খেয়ে বড় হয়েছি। তুই আমার মধ্যে দেখলি জমিদারি অহংকার! তোর চালচলন দেখে আমার মনে হয়েছিল, তুই গ্রেটবেঙ্গল সার্কাসে মোটর সাইকেলের খেলা দেখাতে পারিস।

মেজদা ধরেছেন ঠিক। আমার বাবা সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা দেখাতেন। আমি হাফ বাঙালি, হাফ মাদ্রাজি।

তুই সার্কাস থেকে বড়দার সার্কাসে এলি কীভাবে!

সে মেজদা, আর এক স্টোরি! অনেক সময় লাগবে। আপনি কি সাইকেলের কথা শুনতে চান?

অবশ্যই চাই।

আমি একটা সাইকেল চেপে গিয়েছিলুম, আমি একটা সাইকেল চেপে ফিরে এলুম। ফিরে এসে সাইকেলটাকে বেড়ার গায়ে রেখেই, বড়দার কাজে লেগে গেলুম। এইবার বলুন তো ব্যাপারটা কী হল?

ব্যাপারটা এই হল, তুই জজসায়েবের সাইকেলটা চুরি করলি, আর আমাদের সাইকেলটা চুরি করল অন্য কেউ।

মেজদা, আমার কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে।

কিঞ্চিৎ শব্দটা তুই কোথা থেকে শিখলি?

বড়দার কাছ থেকে। রোজ রাতে বড়দা আমাকে সংস্কৃত শেখাচ্ছেন আজকাল। আমার স্লাইট অবজেকশন আছে মেজদা, আমি চুরি করিনি। আমি চেপে চলে এসেছি। না দেখে চেপে চলে এসেছি।

ঠিক এইসময় বড়মামা হন্তদন্ত হয়ে এসে ঢুকলেন। মুখ চোখ লালচে দেখাচ্ছে। এতটা পথ রোদে রোদে এসেছেন তো। বড়মামা এসেই বললেন, "কী কাণ্ড ভাই রে! ডাক্তারিটা এইবার ছাড়তে হবে। অসম্ভব, অসম্ভব ব্যাপার। এত অসুখ বাড়লে সামলাব কী করে! আটান্নটা ইঞ্জেকশন, একের পর এক। তার মধ্যে একডজন ইন্টারভেনাস। রোগীদের আবার আদিখ্যেতা কত! প্রেশার না দেখলে অভিমান। মুখ অমনি তোলো হাড়ি। বুক-পিঠ তো দেখতেই হবে, আবার পাজরায় তবলা বাজাতে হবে। ব্লাডপ্রেশার মাপা চাট্টিখানি কথা! ফ্যাস ফোস,

ফ্যাস ফোস করেই যাও। ইঃ, এতখানি বেলা হল! তোরা সব অনাহারে! শরৎ দেখি বসে বসে লজেন্স খাচ্ছে।

বড়মামার চোখ পড়ে গেল সাইকেলটার দিকে। এক পলক দেখেই বললেন, নতুন কিনলি বুঝি! কত নিলে?

মেজমামা বললন, এইটাই পার্থর সাইকেল।

অ্যাঁ, বলিস কী রে! চোর এইখানে ডেলিভারি দিয়ে চলে গেছে?

চোর ডেলিভারি দেয়নি বড়দা। তোমার মুকুন্দই চেপে চলে এসেছে।

আর আমাদের সাইকেলটা।

সেইটাই চুরি হয়েছে বড়দা।

তা হলে তো আমাদেরই ডায়েরি করা উচিত। চলো। চলো, থানায় চলো।”

থানায় তো যাব, এইটার কী হবে? এই সাইকেলটার!

বড়মামা সাংঘাতিক চিন্তায় পড়ে গেলেন। আর বড়মামার মজা হল, কোনও কিছুর সমাধান খুঁজে না পেলে ভীষণ রেগে যান। এখনও তাই হল। ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, “এই ভালুকটার জন্যে আমাকে শেষ পর্যন্ত ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে। যাই, থানায় গিয়ে সারেন্ডার করি। সাইকেল চুরির দায়ে তিন বছর বেশ জম্পেশ করে ঘানি ঘুরিয়ে আসি। কুসি ঠিকই বলে, সুধাংশু মুকুজ্যের জীবনে আক্কেল হবে না?

মুকুন্দ বললে, বড়দা সব ব্যাপারে আপনি ভীষণ ভয় পেয়ে যান। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। আমি বেশ বড় মতো একটা গর্ত খুঁড়ে, সাইকেলটাকে সমাধি দিয়ে, তার ওপর নয়নতারা গাছ লাগিয়ে দিই।

মেজমামা বললেন, তার চেয়ে ঝপাং করে বড় পুকুরের জলে ফেলে দিলেই হয়।

মুকুন্দ বললে, চৈত্র মাসে জল কমে এলে, কঙ্কালটা বেরিয়ে পড়বে। এর মধ্যে কেউ যদি জাল ফেলে, উঠে চলে আসবে।

বড়মামা বললেন, পুলিশ যদি কুকুরের সাহায্য নেয় তা হলে কী হবে!

পুলিশকুকুর এ-বাড়িতে ঢুকতেই পারবে না। আমাদের আটটা কুকুরের সঙ্গে ফাইট লেগে যাবে।

শরৎবাবু এসে হাজির। এক মুখ হেসে বললেন, আমি তা হলে আসি। আজ আমার আবার বাগেরহাটে কবিতা পাঠের আসর আছে।

বড়মামা বললেন, তোমার খাওয়া হয়ে গেছে?

আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম তো, তাই ঠিক মনে পড়ছে না। আচ্ছা, আমি কি পান খেয়েছিলুম? তোমরা কেউ দেখেছিলে? আমি যদি পান খেয়ে থাকি, তা হলে আমি নিশ্চয় খেয়েছি। আমার ছেলেবেলা থেকেই এই এক রোগ, স্মৃতিরই ডিফেক্ট, ঘুম থেকে ওঠার পর আমার আর কিছু মনে থাকে না। সব ভুলে যাই, যেন এইমাত্র জন্মালুম।

মাসিমা এলেন। মাসিমার আগমনটা সব সময়েই বেশ ভয়ের।

মাসিমা বললেন, আমার একটাই প্রশ্ন, তোমরা মেয়েদের মানুষ বলে মনে করো?

কেউ কিছু বলার আগে শরৎবাবু বললেন, মানুষ? মেয়েদের আমি দেবী বলে মনে করি। মা দুর্গা, মা সরস্বতী, মা লক্ষ্মী সব একসঙ্গে পেতলে ঢালাই করে...

আপনার কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে এই দুই মহাপুরুষকে নিয়ে।

বড়মামা বললেন, কী কাণ্ড হয়েছে রে কুসি! তুই আমার গলায় যা হয় একটা মালা পরিয়ে দে, আমি চলে যাই।

শরৎবাবু বললেন, তোমাকেও সংবর্ধনা! আমাকেও ওরা আজ সংবর্ধনা দেবে। হাজার টাকা ডোনেশন নিয়েছে ভাই এমনি নয়।

মাসিমা বললেন, কেসটা কী!

বড়মামা বললেন, এই দেখ সাইকেল।

তুমি আমাদের বেলা তিনটে অবধি উপোস করিয়ে রেখে এখন সাইকেল দেখাচ্ছে!

শুধু সাইকেল নয় ভাই, এর আগে একটা বিশেষণ আছে। চোরাই সাইকেল। এই সাইকেলের খোঁজেই একটু আগে পুলিশ চড়াও হয়েছিল।

তুমি কি তা হলে ডাক্তারি ছেড়ে সাইকেল চুরির ব্যবসায় নামলে?

আমি কেন নামব! এ কাজ মুকুন্দর।

শিবঠাকুরের বদনাম হয়েছিল, তার নন্দী, ভৃঙ্গি চেলার জন্যে। তোমারও তাই হবে।

হবে কী হয়ে গেছে। শিবঠাকুরকে জেলে যেতে হয়নি। আমাকে জেলে যেতে হবে।

তা, এখনই যাবে, না দয়া করে কিছু মুখে দিয়ে যাবে?

মেজমামা যে পাথরটার ওপর বসে ছিলেন, বড়মামা সেই পাথরটার ওপর ধপাস করে বসে পড়ে বললেন, “ছিঃ, ছিঃ, কী অপমান! কী অপমান। আমি পার্থর কাছে মুখ দেখাব কী করে!”

মেজমামা ঠোট থেকে পাইপ নামিয়ে বললেন, “ছিঃ, ছিঃ, কী অপমান। আমি আবার টেলিফোনে গরমাগরম দু-চার কথা শুনিয়ে দিলুম; এখন আমি কোন মুখে গিয়ে বলব, ‘পার্থ, এই তোমার সাইকেল! ইস, আমার এতদিনের উচু মাথা একেবারে পাউডার হয়ে গেল।”

মেজমামা বড়মামার পাশে সেই পাথরটার ওপর বসে পড়লেন। বড়মামা মেজমামার কাধে হাত রেখে বললেন, “আয় ভাই, আয়। রাজদ্বারে আর শ্মশানে যে পাশে থাকে সে-ই হল বন্ধু। তুই-ই আমার একমাত্র বন্ধু। আমার সেই নাক-কাটা রাজার গল্পটা মনে পড়ছে। রাজা বানরকে প্রহরী করে তার হাতে তরোয়াল দিয়ে চিত হয়ে ঘুমোচ্ছেন। বানর তরোয়াল হাতে বসে আছে পাশে। একটা মাছি এসে ভীষণ উৎপাত করছে।

মেজমামা বললেন, পড়েছে পড়েছে, আমারও মনে পড়েছে গল্পটা। মাছি বসল রাজার নাকে, বানর মারল তরোয়ালের এক কোপ। ফিনিশ! রাজার নাক খুলে পড়ে গেল।

“নীতিবাক্যটা মনে আছে?

শিয়োর! দুর্জনের সঙ্গে দোস্তি করলে মানুষের বারোটা বেজে যায়। যেমন তোমার বেজেছে।

মেজমামার শেষের কথায় বড়মামা একটু বিরক্ত হলেন যেন। ভুরুর কাছটা কুঁচকে গেল। মেজমামার দিকে তাকিয়ে বললেন, বারোটা আমার একা বাজেনি, তোরও বেজেছে। পার্থ তোরই বন্ধু।

তা হতে পারে, তবে যদি জেলে যেতে হয়, তো আমাকেই যেতে হবে।

কেন? পার্থ তোমার বন্ধু। তুমি যাবে। আমি তোমাকে জামিনে ছাড়িয়ে আনব।

আজ্ঞে না! পার্থ আমার বন্ধু হলেও, তোমার নামই করেছে। পুলিশ তোমাকেই জেরা করতে এসেছিল। তুমি জেলে যাবে। আমি তোমাকে ছাড়িয়ে আনব জামিনে। উলটোটাই হবে বড়দা। আইনের চোখে তোমার গিয়ে বড়, মেজ নেই। অপরাধীই সাজা পাবে। তা ছাড়া মুকুন্দ তোমার লোক।

মুকুন্দ এখন আমার লোক হয়ে গেল! তোমাদের কেউ নয়?

মুকুন্দকে তুমিই এনেছিলে বড়দা।

বড়মামা অসহায়ের মতো মাসিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখছিস কুসি, দেখছিস, কী সাংঘতিক স্বার্থপর।

কে স্বার্থপর নয় বড়দা? তুমি বড় ভাই হয়ে মেজ ভাইকে জেলে পাঠাতে চাইছ। জানো, জেলখানায় কী কষ্ট। ছারপোকা-ভরা কম্বলে শুতে দেবে। খেতে দেবে লপসি। সেলে কোনও পাখা থাকবে না। দুপুর রোদে পাথরের গাদায় বসে খোয়া ভাঙতে হবে। পরনে তোমার থাকবে ডোরাকাটা ইজের আর ফতুয়া। দেখোনি তুমি। আমি একবার একটা হিন্দি সিনেমায় দেখেছিলুম। শিক্ষার জন্যে, জ্ঞানের জন্যে সব কিছু দেখতে হয়।

বড়মামা আবার মাসিমাকে উদ্দেশ করে বললেন, কী যুগ পড়েছে দেখো, পিতৃসম বড়ভাই জেল খাটবে আর মেজভাই বসে বসে পাইপ টানবেন।

মাসিমা গালে আঙুল দিয়ে তার পরিচিত ভঙ্গিতে দাড়িয়ে আছেন। ভেতরে ভেতরে রাগে ফুটছেন; এইবার ফেটে পড়বেন।

শরৎবাবু বললেন, আমি তা হলে যাই, ভাই। তোমরা তা হলে কটা নাগাদ জেলে যাচ্ছ? গাড়িতে যাবে, না রিকশায়?

এইবার মাসিমার অ্যাকশন শুরু হল। রক থেকে নেমে হনহন করে এগিয়ে গেলেন গোয়ালের দিকে। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন, একলট খালি বস্তা। এই বস্তায় আসে গোরুর খাবার। কেউ বুঝতে পারছে না, বড়মামার এইবার কী হবে! মাসিমা বড়মামার দিকে না গিয়ে গেলেন সাইকেলটার দিকে। সাইকেলটাকে বস্তা চাপা দিয়ে, দুই মামার সামনে এসে বললেন, "গেট আপ। গেট আপ। দুটো হুলোর মতো পাশাপাশি বসে ঝগড়া করলে গায়ে এইবার আমি জল ঢেলে দেব। গেট আপ। গেট আপ। তোমাদের একটা আক্কেল নেই। শরৎদার মতো একজন মানুষকে নিমন্ত্রণ করে এনে, তোমাদের ছেলেমানুষি হচ্ছে?"

মাসিমার বকুনি খাওয়ার পর বড়মামা আর মেজমামাকে ফাইন দেখায়। দু'জনেই একটু কুজো, আর ঢিলঢিলে মতো হয়ে যান। সেইভাবেই দু'জনে ভেতর-বাড়ির দিকে চললেন। পেছনে মাসিমা। মাসিমা শাড়ির আঁচলটাকে কোমরে জড়িয়ে নিয়েছেন। দেখতে তো খুবই সুন্দরী, যেন ঝাসির রানি। মাসিমার পেছনে আমরা শরৎবাবু আমার পাশে। ধীরে ধীরে কথা বলেন। ভালমানুষের মতো। আপনমনেই বলতে লাগলেন, যখন এলুম তখন কী আনন্দের সংসার, একটুখানির মধ্যে সব কেমন বদলে গেল। নিশ্চয় সাংঘাতিক কিছু হয়েছে, তা না হলে এমন কেন করবে। কার্য ছাড়া কি কারণ হয়! না, কথাটা মনে হয় ঠিক হল না।

শরৎবাবু ঝপ করে থেমে পড়লেন। খপ করে আমার হাত চেপে ধরলেন, তোমার নামটা যেন কী ভাই?

আজ্ঞে, আমার ডাকনাম বুড়ো, আর ভাল নাম হল প্রদ্যুম্ন।

ইস! সর্বনাশ হয়ে গেলে। দুটো নামই পালটানো দরকার। কে রেখেছিলেন জানি না। যিনিই রাখুন, তোমার কেরিয়ারটা যে ড্যামেজ করে দেবে ভাই। বুড়ো হল নেগেটিভ নাম। তোমার স্পিরিটের গানপাউডার ড্যাম্প করে দেবে। আর প্রদ্যুম্ন ভাবো তো, ইংরেজিতে লিখতে গেলে তোমার কলম দুমড়ে যাবে। আবার ভাবো, তুমি বড় হয়েছ। তোমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কেউ তোমাকে ডাকছে, প্রদ্যুম্নবাবু বাড়ি আছেন? বাড়ি আছেন প্রদ্যুম্নবাবু? উঃ ভাবা যায় না। একটা নামে এতগুলো যুক্তাক্ষর। তারপর ধরো, এই নামটাকে তো শর্ট করা যাবে না। প্রদ্যুম্নকে তুমি কীভাবে ছোট করবে? প্রদু? দ্যুম্ন? আমি তোমার একটা ভাল নাম রাখব। বেশ কাব্যিক। ইচ্ছেমতো ছোট করা যাবে। বড় করা যাবে। ইংরেজি, বাংলা, দুটো ভাষাতেই সহজে লেখা যাবে। সে আমি পরে বইটই দেখে, তোমাকে ঠিক করে দেব। না না, বাজে কথা নয়, আমার কথার ভীষণ দাম। আমার জীবনই, আমার বাণী। না না, এটাও মনে হয় উলটে গেল। এই কথাটা হবে— আমার বাণীই আমার জীবন। সন্দেহ হচ্ছে, ভীষণ সন্দেহ। এই প্রসঙ্গে এই কোটেশনটা যায় কি? আমার কী জানো, কথায় কথায় কোটেশন। তোমাকেও বলে রাখি, কথায় কথায় কোটেশন দেবে। কেন বলো তো! লোকে তোমাকে জ্ঞানী ভাববে, গুণী ভাববে, পণ্ডিত ভাববে। এই শিক্ষাটা আমাকে কে দিয়েছিলেন বলো তো। জানো না! হা হতোস্মি! মামাদের কাছে আমার জীবনী শোনোনি? আমার সম্পর্কে ঘরে ঘরে আলোচনা হয়। তোমাদের ঘরে হয় না

বুঝি! আরে, সেদিন তো আমাকে নিয়ে কোন এক ইউনিভার্সিটিতে একটা সেমিনার হয়ে গেল। কোথায় যেন পড়লুম। কোথায় যেন পড়লুম। কোথায় পড়লুম বলো তো! কোথায় ছাপা হয় এইসব সংবাদ। দৈনিকে? সাপ্তাহিকে? পাক্ষিকে? আচ্ছা, এটাও তোমাকে আমি পরে বলে দেব। কৌতুহলটা ধরে রাখো। বলে না, সেই বলে না, যাঃ ভুলে গেলুম। কী বলে বলো তো। আ-আ, মনে পড়েছে। সবুরে মেওয়া ফলে। কোটেশনটা ঠিক হয়নি। কথায় কথায় কোটেশন। কিন্তু ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিস লাগল কি না, রামে আর রামছাগলে হয়ে গেল। এইটা ঠিক লেগে গেছে, যাকে বলে, একেবারে ঘাটে ঘাটে। এটাকে তুমি আর কাটতে পারবে না। আর তুমি কাটার কে? আমার হাটুর বয়সি। বলে কিনা, আমার কোটেশন কাটবে?

আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। ভয়ে ভয়ে বললুম, কই, আমি তো কিছু বলিনি।

বলিনি মানে? বলবে তো! তোমার এইটুকু ভদ্রতা নেই। তুমি জানো না, কথার পিঠে কথা বলতে হয়। প্রশ্ন করতে হয়। ভাল লাগলে, বাহবা দিতে হয়। তা না হলে, বক্তাকে উপেক্ষা করা হয়। তুমি আমাকে উপেক্ষা করছ। ছিঃ, ছিঃ, তুমি না সুধাংশুর ভাগনে। হবেই তো, হবেই তো। তোমরা হলে একালের ছেলে। তোমাদের কাছে মুড়ি-মিছরির এক দর। বলো, এটাও হয়নি। বলে ফেলো, বলে ফেলো।

আজ্ঞে না, আপনার সব কোটেশনই ঠিক।

আজ্ঞে না মানে? এটা তো হবে আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা কী করে হবে। হ্যাঁ বললে তো সমর্থন করা হল।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, জিনিসটা আমি তলিয়ে দেখি। অত সহজ নয়। সব কিছুর একটা মেথড আছে। কী প্রসঙ্গে, কী কথা এল!

আচ্ছা প্যাঁচে পড়ে গেলুম তো! মুকুন্দটা মহাশয়তান। কেমন আমাকে ফেলে রেখে সুট করে পালিয়ে গেল। মামাদের তাড়া করে মাসিমা সেই যে ভেতরে চলে গেলেন, আর দেখা নেই। শরৎবাবু বলতে লাগলেন, "আমি বললুম, কী বললুম?"

"প্রাণে বাচার জন্যে স্মরণ করিয়ে দিলুম।" শরৎবাবু মনে মনে বিড়বিড় করলেন। ঘাড় নাড়লেন। তারপর দুহাতে তালি মেরে বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক। না-ই হবে। কারণ আমি বলেছিলুম, বলো, এটাও হয়নি। তুমি যদি হ্যাঁ বলতে তা হলে তো হ্যাঁ-ই হত। তাই না! সব কিছু বুঝে নিয়ে নিঃসন্দেহ হওয়াই উচিত, তাতে দুদণ্ড দেরি হয়, হোক। এ তো আর আমরা ট্রেন ধরতে ছুটছি না! অত তাড়া কীসের। সব সময় জানবে, ওয়ারি, হারি অ্যান্ড কারি, এই তিনটে হল গিয়ে আলসারের কারণ। সব সময় ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে, বসে বসে খাবে।"

আজ্ঞে।

হঠাৎ খাওয়ার কথা এল কেন?

তা তো জানি না। আপনি বললেন, তাই বললেন?

এইবার আমি বেঁচে গেলুম। মাসিমা দূর থেকে ডাকলেন, তোমাকে আবার কী রোগে ধরল?

বলতে পারলুম না, শরৎবাবু ধরেছেন।

মাসিমা আবার চিৎকার করলেন, শরৎদা, কী হল আপনার?

শরৎবাবু মাসিমাকে উত্তর না দিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন?

ওই যে আপনি নানারকম কথা বলছিলেন।

হ্যাঁ বলছিলুম। কথা তো বলারই জন্যে। তাতে কী এমন অপরাধ হয়েছে যে তুমি আমার নামে কমপ্লেন করছ।

আমি এতক্ষণে ভদ্রলোককে মোটামুটি বুঝে গেছি। বেশ একটু অপ্রকৃতিস্থ। বড়মামা বলছিলেন, "শরৎবাবু বেশ বড় ঘরের ছেলে ছিলেন। তারপর যা হয়। নিজে একজন গ্রন্থকীট। লেখাপড়ায় সাংঘাতিক ভাল ছিলেন। স্কুলের ফাস্ট বয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট। কলেজে পড়ার সময় মাথার সামান্য গোলমাল হয়। সেইসময় আত্মীয়রা বিষয়সম্পত্তি মেরে পথে বসিয়ে দিয়েছিল। শরৎবাবুর বড়বোন সন্ন্যাসিনী। তিনিই ভাইকে সুস্থ করেন, মানুষ করেন। চাকরি করে দেন। এখন শরৎবাবুর কেউ কোথাও নেই। শরৎবাবুর পিসিমা মারা যাবার আগে ছোট একটা বাড়ি দান করে গেছেন। চাকরিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।"

"যাই," বলে আমি দৌড়োতে শুরু করলুম। এ ছাড়া শরৎবাবুর হাত থেকে বাঁচার রাস্তা ছিল না।

খাবার ঘরে এলাহি আয়োজন। বড়মামা, মেজমামা বসে পড়েছেন। উলটো দিকে শরৎবাবুর স্থান। তার পাশে আমি। শরৎবাবু মনে হয় আসছেন। তিনি কখনও কবি। কখনও বোটানিস্ট, অ্যানথ্রপলজিস্ট। কখন যে কী! তিনি পক্ষীতত্ত্ববিদ হয়ে প্রবেশ করলেন। হাতে একটা বড় পালক। কোথায় খেতে বসবেন, না পালকটা তুলে সকলকে দেখাচ্ছেন আর বলছেন, "এই পালকটা

কোন পাখির তা আমি বলতে পারব না, তবে অবশ্যই কোনও বড় পাখির। বড় পাখির মধ্যে কী কী আছে, উটপাখি, ধনেশ পাখি।”

মাসিমা ছোঁ মেরে পালকটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললেন, এটা কাকের পালক। যান, হাত ধুয়ে খেতে বসুন।

শরৎবাবু বেসিনে হাত ধুতে ধুতে বললেন, ঠিক কাক নয়, দাড়কাক। জ্যাক ড!

আচ্ছা, দাড়কাক, এখন আপনি দয়া করে বসে যান।

মুকুন্দ বনবন করে লাট্টুর মতো চারপাশে ঘুরছে। এটা ঠিক, মাসিমার মতো রান্না হয় না। মুকুন্দর মতো পরিবেশন। শরৎবাবু প্রথমে একটুকরো লেবু নুন মাখিয়ে চুষলেন। চুষেই টকটাক টকটাক, বিকট শব্দ। সকলেই চমকে উঠলেন। শরৎবাবুর সেদিকে কোনও খেয়াল নেই। চোখ বড় বড় করে বললেন, “বাপস, টক বটে।”

মাসিমা বললেন, শুধু শুধু লেবু খাচ্ছেন কেন?

“আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা।” বলেই, আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বললেন, “লক্ষ করলে, কোটেশনটা কীরকম কটাস করে লাগিয়ে দিলুম। এইসব লক্ষ করবে। অ্যাপ্রিসিয়েট করবে। ভাল গান শুনতে শুনতে মানুষ যেমন ওয়া, ওয়া করে, সেইরকম করবে। লেবু কেন খেলুম বলো তো! অ্যাসিড সাইট্রিক। এই অ্যাসিড দিয়ে পেটে একটা বাতাবরণ তৈরি করলুম। শব্দটা লক্ষ করো, বাতাবরণ। মানে ক্লাইমেট বাংলা শব্দ কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, শেখো শেখো। শুধু হনুমানের মতো হাউ হাউ করে খেলেই হবে। বাড়ি করতে গেলে সবার আগে যেমন একটা ফাউন্ডেশন করতে হয়, সেইরকম এই লেবু হল

খাওয়ার ফাউন্ডেশন, এইবার যা কিছু পেটে ঢুকবে, এই অ্যাসিড একেবারে ক্ষুধার্ত বাঘের মতো অ্যাটাক করবে। পেটের ভেতর চালু হয়ে যাবে একটা কেমিকেল ফ্যাক্টরি। সমস্ত খাদ্যকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে একেবারে পাল্প করে ফেলবে। এর ইংরেজি নাম হল ফাইল।”

শরৎবাবু বড়মামার দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাক্তার, তুমি এইসব জানো? জানো তো ছেলেটাকে শেখাও না কেন? পৃথিবীটা হল জ্ঞানের পৃথিবী। তোমাদের বাড়িটাকে কীরকম করে রেখেছ জানো, নলেজ, নলেজ, এভরি হোয়ার নট এ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক। মেজবাবু কোটেশনটা কি চেনা চেনা মনে হল? একটা শব্দ কেবল বদলে দিয়েছি। তুমি সাহিত্যের লোক হয়ে চিনতে পারছ না! আশ্চর্য!

মেজমামা বললেন, পারব না কেন? ওয়াটার ওয়াটার এভরি হোয়ার। ওয়াটারের জায়গায় নলেজ।

ওয়া, ওয়া! তা কার লেখা?

কোলরিজ।

ওয়া, ওয়া। এই হল নিয়ম। খাওয়ার টেবিলটাকে জ্ঞানের টেবিল করে তুলতে হয়। দেহের আহার আর মনের আহার অ্যাট এ টাইম। দেহও খাচ্ছে আর মনও খাচ্ছে। কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড, হ্যারো আর ইটানে এই জিনিস হয়। ডিনরা সব ডিনার টেবিলে বসে এইরকম জ্ঞানের আলোচনা করতে করতে কী যে করে ফেলেন না! বড় বড় থিসিসের আইডিয়া বেরিয়ে আস। এই যেমন ধরো, করলা। এই যে সরষেবাটা দিয়ে করলা হয়েছে। গুড আইটেম। খেলেই খাওয়া। এর মধ্যে জ্ঞান আর নলেজটা কী আছে? ভীষণ জ্ঞান আছে। করলা কেন তেতো! তিক্ত কেন করলা!

শরৎবাবু একটা করলার টুকরো মুখে পুরে কৌতুহলী হয়ে সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন।

মেজমামা বললেন, এটা আপনার গিয়ে কেমিষ্ট্রি-ঘেষা প্রশ্ন। এর উত্তর আমার জানা নেই।

শরৎবাবু আর-একটা করলা মুখে পুরে বললেন, এইটাই হল আমার জীবনের ট্র্যাজেডি। সারা জীবন আমি প্রশ্ন করে গেলুম, একের পর এক। কদাচিৎ একটা-দুটোর উত্তর পেলুম, বাকি সব নিজের উত্তর নিজেকেই খুঁজে বের করতে হয়েছে। তোমরা মোটেই অনুসন্ধিৎসু নও। দিনের পর দিন করলা খাচ্ছ, অথচ একবারও তোমাদের মনে প্রশ্ন এল না! আশ্চর্য! অত্যাশ্চর্য!

মেজমামা বরলেন, জানা থাকলে, অনুগ্রহ করে বলে দিয়ে পরিস্থিতিটা একটু শান্ত করুন না।

প্রশ্নটা আমার মগজেও আজই এল। সব সময় সব প্রশ্ন তো মাথায় আসে না। প্রশ্ন হল অর্কিডের ফুলের মতো। কোনও কোনও অর্কিডে ষাট বছরে একবারই হয়তো ফুল ফুটল। আমার মনে হয়, উচ্ছে আর করলা হল মাছের পিত্ত, কী মানুষের গলব্লাডারের মতো, ফলরূপী পিত্তথলি। এর ভেতর একটা বিটার প্রিন্সিপল আছে। যেমন আছে হপস গাছে। উত্তরটা ঠিক মনের মতো হল না; তবে একেবারে না হওয়ার চেয়ে তো ভাল।

মাসিমা শরৎবাবুকে থামাবার জন্যে বললেন, আমাদের শাস্ত্রে আছে, খেতে বসে যত কম কথা বলবেন ততই ভাল।

ওটা তোমার বোন, দিশি শাস্ত্র। বিদেশে অচল। বিদেশে লাঞ্চ আর ডিনার হল, খাও, গল্প করো, আলাপ-আলোচনা করো। সে-দেশের নিয়ম হল, লিভ

টুইট, নট ইট টু লিভ। না দাড়াও, গুলিয়ে গেছে। এই ধরনের কোটেশন ভীষণ ডেঞ্জারাস। মানে বাংলাটা হল, বাচার জন্যে খাও, খাওয়ার জন্যে বেঁচো না। এইবার ধরে ধরে ইংরেজিটা করি, ইট টু লিভ, নট লিভ টু ইট। অ্যা, এইবার হয়েছে। ইংরেজি অনুবাদ হল ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং-এর মতো। এক লাইন থেকে আর এক লাইনে ধরে ধরে এগোতে হয়।

শরৎবাবু কথা বললেও, আমরা সুপসাপ খেয়ে চলেছি। মাসিমা আজ মোট ষোলোরকম রান্না করেছেন। আর-একটু সময় পেলে বিশ-তিরিশরকম তো হতই।

বড়মামা বললেন, এত সব খাওয়ার আয়োজন; কিন্তু অপরাধীর মন নিয়ে কি খাওয়া যায়! এ মনে হচ্ছে ডেডবডি ট্র্যাঙ্কে ভরে রেখে আমরা খেতে বসেছি। এ মনে হচ্ছে, সাইকেলের কবরে বসে খুনির খানাপিনা।

শরৎবাবু 'ওয়া, ওয়া' করে বললেন, অসসাধারণ একটা কবিতার লাইন। শুধু সাইকেল শব্দটা হাটাতে হবে। লাইনটা হবে, গতির কবরে বসে খুনিদের খানাপিনা। কলিজার করমচা খুন পল-কাটা গেলাসে গেলাসে।/ জীবন যদিও এক তিক্ত করলা/ বসে আছি মুখোমুখি তড়িৎ-প্রবাহ ধরে।

শরৎবাবু মাছের মুড়ো ফেলে উঠে দাঁড়ালেন।

মাসিমা বললেন, কি হল?

শরৎবাবু বললেন, আর কী হল? এসে গেল। কবিতার লাইন জগতের ওপার থেকে ভেসে আসে ইথার তরঙ্গে। ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সংগীত ভেসে আসে।

আসুক না, আপনি খেয়ে নিন।

পাগল হয়েছ। ভেসে বেরিয়ে যাবার আগে আমার রিসিভার ধরে রাখতে হবে। আমার ডায়েরি, আমার কলম।

আপনি খান, আমি লিখে রাখছি।

শরৎবাবু শান্ত হয়ে বসলেন। মাসিমা একটা সন্দেশের কৌটোতে ফেল্ট পেন দিয়ে লিখতে বসলেন। ফ্রিজের মাথাটা হয়েছে টেবিল।

মাসিমা বললেন, বলুন।

খুনিদের কবরে বসে। না, কীসের যেন কবর বললে।

আমি বললুম, আমার পুরোটা মনে আছে। বলব? গতির কবরে বসে খুনিদের খানাপিনা। কলিজার করমচা-খুন পল-কাটা গেলাসে গেলাসে। জীবন যদিও এক তিক্ত করলা। বসে আছি মুখোমুখি তড়িৎ-প্রবাহ ধরে।

"ওয়া, ওয়া।" শরৎবাবু সব ভুলে, তার ঝালঝোল মাখা ডান হাত দিয়ে আমার পিঠটা বার কয়েক চাপড়ে দিলেন।

মাসিমা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বুড়ো, যাও, উঠে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে আগে চান করে এসো।

চার

শরৎবাবু এত খেলেন যে, শেষ পর্যন্ত মুকুন্দর সাহায্য নিয়ে তাঁকে খাওয়ার টেবিল থেকে উঠতে হল। তিন-চারটে বিশাল ঢেকুর তুললেন। মাসিমাকে বললেন, তোমার উচিত ছিল আমাকে একসময় থামিয়ে দেওয়া। তুমি জানো না দুটো জিনিসে আমার জ্ঞান থাকে না। এক রেগে গেলে আর খেতে বসলে। এত চাপ খাওয়া আমার উচিত নয়। হার্টের তো আর তেমন জোর নেই। এর মধ্যে দু'বার ধাক্কা খেয়েছে। এখন গুড আর ব্যাড, কিছু একটা হয়ে গেলে আমার আর কী, তোমরাই বিপদে পড়ে যাবে।

আমি আর মুকুন্দ শরৎবাবুকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলুম। শুয়ে পড়ে বললেন, আমার আবার অজগরের স্বভাব। পেটে চাপ পড়লেই, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। শোনো, তোমার মাসিকে বলো, ওই যে ওই ফিশকোর্মা, ওইটা এক বাটি সরিয়ে রাখতে; যদি মরে না যাই রাতে আবার মুখোমুখি হব। মরতে আমি ভয় পাই না। জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন, শত মাংস, শত মৎস্য আসিবে আসুক।

ঘাঁড়াক করে একটা শব্দ হল। শরৎবাবুর নাক গর্জন করতে লাগল কামানের মতো।

মুকুন্দ বললে, বেশ মজার মানুষ, তাই না। এইরকম দু-তিনজন বাড়িতে থাকলে ড্রামা একেবারে জমে যাবে।

তোমার আর কী বলো, আমাকে যা ধরেছিলেন না! সেই বাগান থেকে খাবার টেবিল পর্যন্ত। বাব্বা, এ যেন ছেলে ঘুমোল, পাড়া জুড়োল।

বসবার ঘরে বড়মামা আর মেজমামা বসে আছেন, দুটো ডেকচেয়ারে। মাসিমা এইমাত্র এলেন। মুকুন্দ বসে আছে এক পাশে। মুকুন্দ বললে, এটাকে চুরি বলে না বড়দা, একে বলে বদলাবদলি।

বড়মামা বললেন, চুপ কর। তোর, তোর, তোর...।

মেজমামা শেষ করে দিলেন, কথা বলার কোনও অধিকার নেই।

বড়মামা বললেন, না, না, আমি ও কথা বলতে চাইনি। আমি বলতে চেয়েচিলুম, তোর জন্যে আজ আমার এই অবস্থা, অমন কিশমিশ-টিসমিস দেওয়া ছানার কালিয়া, মনে হল ঘুটের কালিয়া খাচ্ছি।

মেজমামার অভিমান হল। বললেন, এবার থেকে নিজের কথা নিজেই শেষ কোরো। আটকে গেলে আমি আর সাহায্য করব না। অধিকার নেই, বললে এক কথায় মিটে যায়, অত কথা এই বিপদের সময় বলার দরকার কী?

মাসিমা বেশ আয়েশ করে বসে বললেন, আচ্ছা, ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলো তো। তখন থেকে চলেছে।

মুকুন্দ এগিয়ে এল, আমি আপনাকে ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

মাসিমা বললেন, সে আবার কী, এ তোমার বাড়ির প্ল্যান না জ্যামিতি, যে ছবি আঁকতে হবে।

মেজমামা বললেন, ওকে আজ ছবি-ভূতে ধরেছে। আসলে কেসটা হল কীরকম জানিস, বদলাবদলি চুরি। অর্থাৎ পালটিঘরে চুরি। মানে, আমরা পার্থর সাইকেল চুরি করেছি, পার্থ আমাদের সাইকেল চুরি করেছে।

বড়মামা বললেন, যাঃ, কী যা-তা বলছিস! কোনও একটা জিনিস ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে পারিস না, প্রোফেসর হয়েছিস!

পাশের টেবিলের ওপর থেকে খপ করে পাইপটা তুলে নিয়ে মেজমামা উঠে দাঁড়ালেন।

বড়মামা বললেন, কী হল? তোর আবার কী হল!

কথায় কথায় তোমার অপমান আমার আর সহ্য হয় না। তোমার সমস্যা তুমি সামলাও। আমারই ভুল হয়েছে তোমার ব্যাপারে নাক গলাতে যাওয়া।

বড়মামা বললেন, আমিও লক্ষ করছি, আজকাল আমার কোনও কথাই যেন তোমাদের সহ্য হচ্ছে না। যা বলছি তাইতেই গায়ে সব বড় বড় ফোসকা পড়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমিও তা হলে চলে যাই। যা হয় হবে। আমার কী। চিরকাল শুনে এলুম, ডিভাইডেড উই ফল, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড।

ইস, বড়মামার গায়েও শরৎবাবুর বাতাস লেগেছে। কোটেশন উলটে যাচ্ছে।

মাসিমা বললেন, তোমরা দু'জনে যদি সাপে-নেউলে হও, তা হলে এইবার কিন্তু আমাকে লাঠিই ধরতে হবে; লাঠিই হল তোমাদের ঠান্ডা রাখার ওষুধ। বয়েসটয়েস আমি আর মানব না। চুপ করে দু'জনে বোসো। সমাধান যদি চাও, কেসটা আমাকে খুলে বলো।

মেজমামা বসলেন। বড়মামা বললেন, পরে তোর প্রেশারটা আমি একবার চেক করব।

মেজমামা বললেন, বুঝতে পেরেছি, আমার বিবৃতিতে ভুলটা কোথায় হচ্ছিল। আমার প্রেশার নয়, আমার অহংকারটা মাপা দরকার হয়েছে। আমি আবার শুরু থেকে শুরু করি। আমরা পার্থর সাইকেলটা চুরি করেছি, আর পার্থ আমাদের সাইকেলটা চুরি হওয়ায় সাহায্য করেছে।

বড়মামা বললেন, দ্যাটস রাইট। এইবার বিবৃতিটা ঠিক হল।

মুকুন্দ বললে, আমি একটু বলি, কারণ এটা আমার কেস।

মাসিমা বললেন, বলো।

এটা চুরি নয়, ভুল। আসলে আমাদের সাইকেলটাই চুরি হয়েছে; কিন্তু মনে হচ্ছে চুরি গেছে জজসায়েবের সাইকেল।

সে আবার কী! গোয়ালের পাশে যে সাইকেলটি চট চাপা দিয়ে এলুম, সেটা তা হলে কার সাইকেল?

ওইটাই তো জজসায়েবের সাইকেল।

সে এনেছে?

আমি এনেছি।

না বলে?

হ্যাঁ, না বলে।

তা হলে! শোনোনি তুমি! না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করাকে চুরি বলে।

আমি তো চুরি করব বলে চুরি করিনি। চুরির মতো দেখাচ্ছে।

উঃ, বাব্বা রে! কী পাল্লায় পড়েছি রে!

আপনি পুরোটা না শুনলে তো বাবারেই মনে হবে। আমি জজসায়েবের বাড়ির রেক, জজসায়েবের সাইকেলের পাশে আমাদের সাইকেলটা রেখে ভেতরে গেলুম। তা হলে বাইরে পাশাপাশি রইল দুটো সাইকেল। কেমন? এইবার কী হল, সার্টিফিকেট নিয়ে আমি বাইরে এলুম। দেখলুম রয়েছে একটা সাইকেল। আমি সাইকেল চেপে চলে এলুম। গোয়ালের বাইরে সাইকেল রেখে লেগে গেলুম কাজে। তা হলে ব্যাপারটা কী হল? চুরি হল কি?

মাসিমা বললেন, ঘোড়ার ডিম হল। এই নিয়ে এত কাণ্ড। আসলে কোনও সাইকেলই চুরি হয়নি। বদলাবদলি হয়েছে। গিয়ে দেখে এসো, তোমাদের ঝরঝরে সাইকেল আবার ফিরে এসেছে যথাস্থানে।

বড়মামা বললেন, তা হলে ওরা থানায় রিপোর্ট করল কেন?

করবে না! ওদের সাইকেলটা তো নেই।

তা অবশ্য ঠিক। এখন তা হলে কী হবে?

সোজা ব্যাপার। এই সাইকেলটা চেপে তোমরা কেউ যাও, এটা ফেরত দিয়ে ওইটা চেপে ফিরে এসো।

কে যাবে, মুকুন্দ?

না, তোমরা কেউ যাও।

মেজমামা বললেন, আমিই তা হলে যাই?

মেজমামা আমাকে বললেন, যাবে নাকি?

আমরা দু'জনে বেরিয়ে পড়লুম। বাগান থেকে জানালা দিয়ে দেখতে পেলুম শরৎবাবু কুম্ভকর্ণের মতো চিত হয়ে শুয়ে আছেন। নাক ডাকছে তুমুল শব্দে।

মেজমামা বললেন, উঃ, মানুষের কী কষ্ট! কোথায় যেন যাবার কথা ছিল, কী হল?"

উনি তো সবই ভুলে যান, তা ছাড়া বলছিলেন খাওয়ার পর অজগর হয়ে যান। ছেড়ে দিন আপনি।

মেজমামা সাইকেলে উঠে একটু লগবগ করলেন। তারপর রাস্তার একপাশে কাঁচা নর্দমার ধারে কাত হয়ে গেলেন। ভাগ্য ভাল, লম্বা মানুষ, তাই

মাটিতে পা ঠেকিয়ে কোনওরকমে সামলে নিলেন। সেই কাত-অবস্থাতেই বললেন, “ম্যাগনেট যেমন লোহাকে টানে, সেইরকম নর্দমা টানে সাইকেলকে। দাঁড়া আবার একবার গোড়া থেকে শুরু করি।

মেজমামা অনেক কায়দায় সাইকেল থেকে নামলেন। নামতে গিয়ে আমন সাধের পাইপটা বুকপকেট থেকে ছিটকে পড়ে গেল নর্দমায়। রাগে মেজমামার মুখটা লাল হয়ে গেল, উনুনের নিবে-আসা আগুনের মতো। ভড়ভড়ে নর্দমায় রুপোর ঠোটঅলা পাইপটা ভেসে রইল।

মেজমামা বললেন, কত বড় ক্ষতিটা হয়ে গেল একবার দেখলে? এই সাইকেলটা হল অপয়া সাইকেল। সেই সকাল থেকে জ্বালিয়ে মারছে।

মেজমামা, আপনার যাওয়াটা মনে হয় ঠিক হবে না। বাধা পড়ে গেছে।

সেটা অবশ্য ঠিকই বলেছ তুমি। তা না হলে আমার মতো পাকা সাইক্লিস্টের এই অবস্থা হবে কেন? চলো, ফিরেই যাই।

মেজমামার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, হুস করে একটা মোটরগাড়ি এসে গেল। গাড়িটা আমাদের থেকে কিছু দূর গিয়েই ঝপ করে থেমে গেল। গাড়ির পেছনের জানালা দিয়ে একটা মুখ বেরিয়ে এল। জাস্টিস পার্থ ব্যানার্জি।

পার্থ ব্যানার্জি বললেন, আরে কী ব্যাপার! চলেছ কোথায়? আমি তো তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি, বড়দার কাছে ক্ষমা চাইতে। ছিঃ ছিঃ, কী জঘন্য কাণ্ডটাই না ঘটে গেল।

মেজমামা বললেন, আরে, আমি তো যাচ্ছি তোমাদের বাড়িতে! কী বিশ্রী কাণ্ড ভাই। আমাদের মুকুন্দ ভুল করে তোমার সাইকেলটা নিয়ে এসেছিল।

আমাদের সাইকেল আর তোমাদের সাইকেল পাশাপাশি ছিল। খেয়াল করেনি। বয়েস কম তো, আর সব সময় তড়বড় করে।”

আমার সাইকেল? আমার সাইকেল তো আমি পেয়ে গেছি।

পেয়ে গেছ মানে? কোথা থেকে পেলে? ওটা তা হলে আমাদের সাইকেল।

তোমাদের সাইকেল কী করে হবে? থানা থেকে উদ্ধার করে দিয়ে গেছে।

এটা তা হলে কার সাইকেল?

তা তো জানি না ভাই।

মেজমামা সাইকেলটার দিকে তাকিয়ে বললেন, তাজ্জব ব্যাপার। এটা তা হলে সাইকেলের ভূত। তাই বলি, আমার মতো পাকা লোককে নর্দমায় ফেলার তাল করেছিল। জজসায়েব মুখটাকে গাড়ির ভেতরে টেনে নিতে নিতে বললেন, চলে এসো। আমি বাড়িতে যাচ্ছি।

মেজমামা আমাকে বললেন, বুঝলে কিছু। সাইকেল রহস্য। লিখতে জানলে, একটা উপন্যাস লিখে ফেলতুম। যেখানে বড়দা, সেইখানেই যত গোলমাল। বড়দার একটা ব্যাপারও সহজ নয়। তা না হলে কেউ বাজার করতে গিয়ে কীর্তন গাইতে গাইতে ফিরে আসে।

মেজমামা পাইপ খুইয়ে, ভৌতিক সাইকেল নিয়ে, আমাকে নিয়ে ফিরে এলেন। জজসায়েবের ঝকঝকে সাদা গাড়ি আমাদের বাড়ির হাতায় গরম হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ড্রাইভারের কী পোশাক। জজসায়েবের গাড়ির চালক। সাদা পোশাক, সোনালি কলার। মেজমামা সাইকেলটাকে আবার বেড়ার গায়ে হেলিয়ে রাখলেন। রেখেই একটা লাথি মারলেন। মেজমামার এই এক দোষ । মারার

আগে চিন্তাও করলেন না, কাকে মারছেন! সাইকেল তো আর নরম মানুষ নয়। লোহার তৈরি কঠিন বস্তু। পায়ে লেগেছে। মেজমামা দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, জানোয়ার! যেমন দেখতে তার সেই রকমই ব্যবহার!

মেজমামা অল্প একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। ঘর আলো করে বসে আছেন আমাদের জজসায়েব। উলটো দিকে বড়মামা। আমরা ঢুকতে ঢুকতে শুনলুম বড়মামা বলছেন, থাক, সাইকেলটা তা হলে পেয়ে গেলে! পাবেই তো। তুমি জজসায়েব, তোমার সাইকেল সহজে হজম করা শক্ত। যাক, আমার একটা দুশ্চিন্তা কেটে গেল। তোমরা বলো, পুলিশ চোর ধরতে পারে না, এই তো কেমন ধরে দিলে!

পুলিশ চোর ধরেনি, ধরেছে সাইকেলটা।

তার মানে, সাইকেলটা একা একা ঘুরছিল, আর পেছন দিক থেকে গিয়ে ঘ্যাক করে কলার চেপে ধরেছে?

না না, ঠিক তা নয়, পুলিশ তিরিশ কি চল্লিশটা সাইকেল চোরাই মালের ডিপো থেকে একেবারে লাইন করে নিয়ে এল। বললে বেছে নিন। আমাদের মান্ত একটা বেছে নিলে। বাকিগুলো আবার লাইন করে ফিরে গেল।

ফিরে গেল? ইস, তুমি যদি একবার আমাকে ডাকতে! তা হলে আমার সাইকেলটাও ফিরে পেতুম।

অ, আপনার সাইকেলও গেছে?

একটা! তিন-তিনটে সাইকেল আর শ'খানেক ছাতা, পঞ্চাশ জোড়া জুতো, হাজারখানেক রুমাল, একডজন ঘড়ি। সত্তরটা কলম। ছটা সোনার আংটি।

দেড়হাজার নস্যির ডিবে। চল্লিশটা থার্মস ফ্লাস্ক। দশ থেকে বারো হাজার নগদ টাকা।

এই লিস্টের মধ্যে বেশিরভাগই হারানো।

আরে আমার হারানো মানেই তো আর-একজনের চুরি।

চুরি নয়, কুড়িয়ে পাওয়া।

মেজমামা একপাশে গুম মেরে বসে আছেন। মাঝে মাঝে পায়ের আঙুল দেখছেন। বেশ লেগেছে। মুখে সেই বিখ্যাত পাইপ নেই। পাইপ এতক্ষণে নর্দমায় ডুবে গেছে। এর চেয়ে দুঃখের আর কী আছে, পকেটে সদ্য কেনা মোটা এক প্যাকেট টোব্যাকো, অথচ ঠোঁট-হুকোটাই নেই।

জজসায়েব বললেন, কী হল তোমার? অমন ব্যাজার মুখে বসে আছ?

আমার পাইপটা নর্দমায় পড়ে গেছে। আমার দীর্ঘদিনের সঙ্গী। ওই পাইপ তো আর এ-দেশে পাব না।

এই তোমার প্রবলেম। আমি সমাধান করে দিচ্ছি। জজ হবার পর আমার ইচ্ছে হয়েছিল, সিনেমার জজ হব। একটা ড্রেসিংগাউন কিনলুম, আর বিদেশ থেকে আনালুম গোটা পঞ্চাশ ভাল ভাল পাইপ। সবই ডানহিল। তারপর চেয়ারে বসে মাথাটা ঠিক হয়ে গেল। কাহিনিতে আর বাস্তবে অতলান্তিকের ব্যবধান। গাউনটা কেটে ঘরমোছা করা হয়েছে। আর স্ত্রী এসে ধুমপান বন্ধ। আমার সংগ্রহে বহু ভাল ভাল নতুন পাইপ পড়ে আছে। তুমি আমার সঙ্গে চলো, পছন্দ করে নিয়ে আসবে।

মেজমামার মুখে হাসি ফুটল। বড়মামা মাঝে মাঝেই আমাকে বলেন, তোমার পাইপমামার খবর কী! ওর মুখ থেকে পাইপটা খুলে নিলে, সব বোলচাল বন্ধ হয়ে যাবে।

মাসিমা এলেন, পেছনে পেছনে মুকুন্দ। আমাদের জজসায়েবও শরৎবাবুর মতোই ভোজনবিলাসী। একসময় পার্থবাবু আমার মাসিমাকে পড়াতেন। সব বড় বড় মানুষেরই ছোট ছোট একটা শুরু থাকে। সেই হাফপ্যান্ট পরে স্কুলে যাওয়া। পেটাই হওয়া। নিলডাউন। দু'কান ধরে বেঞ্চের ওপর দাড়ানো। অভাব, দুঃখ, কষ্ট কত কী খেতে ইচ্ছে করে, পয়সা নেই। কত কী পরতে ইচ্ছে করে, পয়সা নেই। তারপর টিউশনি করে পড়ার খরচ তোলা। তারপর মা সরস্বতীর কৃপায় সে-কী পরীক্ষার ফল। ফাস্ট, ফ্লাস্টক্লাস, গোল্ড মেডেল। ডব্লু বি সি এস, আই এ এস। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিস্টার। এই জজসায়েব, মেজমামার মুখে যা শুনেছি, হারিকেনের আলোয়, চালাবাড়িতে রাত জেগে লেখাপড়া করেছেন, আর দিনের বেলায় কলেজ করেছেন, ছাত্র পড়িয়েছেন। মাসিমা ছিলেন তার ছাত্রী।

ক্ষীরের লুচি, মালাই চপ, নার্গিসি কোফতা, জল পাকোড়া, অন্যদিন হলে আমার ভয়ংকর লোভ হত। আজ ভীষণ বেলায় খাওয়া হয়েছে, তাই আর রান্নাঘরের দিকে ছুটে যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে না। জজসায়েবকে মাসিমা কখনও বলছেন মাস্টারমশাই, কখনও বলছেন পার্থদা। জজসায়েব বলে এতটুকু ভয় পাচ্ছেন না। যেমন সবাই বলে, তুমি জজসায়েব কি কমিশনার, সে তুমি তোমার অফিসে, বাড়িতে তুমি আমাদের ভট্ট, কি মাস্তু, কি পার্থদা।

“আহা! বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে,” বলে পার্থবাবু বেশ গপাগপ খেতে লাগলেন। চোখে-মুখে একটা রেশমকোমল ভাব ফুটে উঠল। আর ঠিক সেই সময় শরৎবাবু এলেন। ঘরের মাঝখানে এসে বিশাল একটা হাই তুলে বললেন, “আঃ, যাকে বলে গভীর ঘুম, সেইরকম একটা ঘুমে রুপোর টাকার মতো তলিয়ে ছিলুম। আমার সিস্টেমের একটা মজা আছে, কত পরিশ্রম করলে তবে মানুষের হজম হয়, আর আমার দেখো, এক ঘুম, এক হজম। মানে সিরিজটা দেখো, খেলুম, ঘুমোলুম, হজম করলুম। আবার খেলুম।”

চেয়ারে বসতে বসতে প্রশ্ন করলেন, “কারও কিছু বলার আছে? আমি জানি আছে। তোমরা প্রশ্ন করবে, তা হলে লেখাপড়াটা কখন হবে? হবে? এরই ফাঁকে ফাঁকে হবে। খাওয়ার পর তোমরা জানো যে, মানুষ ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সেই ক্লান্তি কাটাবার জন্যে নিদ্রা। নিদ্রা থেকে উত্থান এবং আরএকটা আহারের মাঝে যদি সময় থাকে তা হলে একটু লেখা হল, একটু পড়া হল। আসলে আহারের জন্যেই বাঁচা।

শরৎবাবু একটা হাই তুললেন। সকলের মুখের দিকে এক-একবার তাকালেন একটু বিব্রতভাবে, শেষে প্রশ্ন করলেন, কথাটা কি ঠিক বললুম? আমার আজকাল হয়েছে কী, সব ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। জানা জিনিসও গুলিয়ে যাচ্ছে। কথাটা কী ভাই, আহারের জন্যে বাচা, না বাচার জন্যে আহার। সে যাই হোক, দুটো কথাই এক। এখন আমার প্রশ্ন হল, এই মুহূর্তে কিছু খেতে হবে কি? তা হলে আমি মোটামুটি প্রস্তুত।

জজসায়েবের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন শরৎবাবুর দিকে।

বড়মামা পরিচয় করিয়ে দিলেন, “ইনি আমার বিদ্যা-জীবনের একান্ত সুহৃদ, রায়বাহাদুর ঈশ্বর শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র সন্তান লেখক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শরৎবাবু সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি তুললেন, দুটো কারেকশন। প্রথম নামে। আগে চন্দ্র ছিল, পাছে আর-এক বিখ্যাত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কেউ গুলিয়ে ফেলেন, তাই চন্দ্রটা আমি অফ করে দিয়েছি। এখন, সহজ-সরল শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় আমি লেখক নই। আমি কবি। কবি শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায় হল আমার সঠিক পরিচয়। তৃতীয়, আমার পরিচয়লিপিতে একটু অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে। আমি শুধু কবি নই, আমি শিকারি, আমি পক্ষীতত্ত্ববিদ, আমি নেচারোপ্যাথিস্ট। আরও অনেক পরিচয় আছে আমার। পরে মনে পড়লে বলব। আমি আবার আত্মপ্রচার তেমন পছন্দ করি না, তাই সব কিছু তেমন মনে রাখি না। যেমন এইমাত্র আমার মনে পড়ল, দুর্গাপুজো কমিটির আমি পারমানেন্ট প্রেসিডেন্ট।

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এবার আমাকেও স্থানীয় পূজা কমিটির প্রেসিডেন্ট করেছে। আজই চিঠি পেয়েছি সকালে। আচ্ছা, প্রেসিডেন্ট হলে কি নিজের নামে আলাদা করে প্যাড ছাপাতে হবে? তুমি তো শরৎ, এইসব ব্যাপারে আমার চেয়েও অভিজ্ঞ।

অভিজ্ঞ তো বটেই। আমাকে ছাড়া, কোনও সঙ্ঘ, সংগঠন অন্য কাউকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ভাবতেই পারে না। প্যাড তো তোমাকে ছাপাতেই হবে। আমার প্যাডের মাথাটা দেখেছ। তিন থেকে চার ইঞ্চি চওড়া পটির মতো পরিচয়-লিপি। চিঠি লেখার মতো সাদা জায়গা খুঁজে বের করতে হয়। উঃ, একটা মানুষের

এত পরিচয়ও থাকে। এই দেখো না, এখন সব মনে পড়ছে একে একে। জামালপুর হিন্দু সৎকার সমিতির অনারারি প্রেসিডেন্ট। জামালপুর হরিসভার সহ-সভাপতি, ঘাস-সংরক্ষণ সমিতির চেয়ারম্যান। বিশ্ব বিস্মরণ সংস্থার সদস্য।”

জজসায়েব বললেন, বিস্মরণ সংস্থার সদস্য।

সেটা হল গিয়ে বেশ মজার সংস্থা। পৃথিবীতে বহু মানুষ আছে যারা ভুলে যায়। কোনও কিছু মনে রাখতে পারে না। যাকে বলে ফরগেটফুল। এই ছাতা কোথায় রাখছে, এই ব্যাগ কোথায় রাখছে, বাবার নাম ভুলে যাচ্ছে, বাড়ির ঠিকানা ভুলে যাচ্ছে। এমন কত লোক আছে এই বিশাল পৃথিবীতে হারিয়ে বসে আছে, নিজের পরিচয় ভুলে। এদের সাহায্য করাই হল বিশ্ববিস্মৃতি সংস্থার কাজ। আমাদের টেলিফোন নম্বর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া আছে। আমাদের ফোন করলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করব। হয়তো, ফোন এল, বলতে পারেন, আমার নোট লেখা ডায়েরিটা কোথায় রেখেছি। আমরা বলব, নাম-ঠিকানা বলুন। যে-ই নাম-ঠিকানা পেলুম, সঙ্গে সঙ্গে শাঁ শাঁ করে আমাদের ভলান্টিয়ার পার্টি চলে গেল। তিন মিনিটে বের করে দিয়ে এল ডায়েরি। একজন বক্তৃতা করছেন। নাম ভুলে গেছেন। থিয়োরি অব রিলেটিভিটির প্রবক্তার। আমাদের কাছে ফোন এল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলুম, বাট্রান্ড রাসেল। সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা চালু হয়ে গেল।”

“অ, আইনস্টাইন। সে ব্যবস্থাও আমাদের আছে। আমাদের সাহায্যকারীরা যখন কিছু বলে, তখন তার পাশে একজন, তার পাশে আর-একজন, তার পাশে আরও একজন, পরপর সব লাইন দিয়ে বসে থাকে। এ ভুল করল তো ও সংশোধন করল, ও করল তো সে সংশোধন করল। টু ফরগিভ

ইজ হিউম্যান, টু আর ইজ ডিভাইন না, কথাটা কেমন হল। ঠিক যেন জয়েন্টে জয়েন্টে লাগল না। অ্যাই দেখুন। একে বলে বিস্মরণ। আমাদের সংস্থার কেউ পাশে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে দিত। কোটেশন হল, ইলেকট্রিকের লাইন টানার মতো। ঠিক না হলে ধরা যায়। এই যেমন আমি ধরতে পারছি, ঠিক করতে পারছি না।

মেজমামা বললেন, ওটা হবে, টু আর ইজ হিউম্যান, টু ফরগিভ ডিভাইন।

অ্যাই, দেখেছ তো, এইবার খাঁজে খাঁজে মিলে গেল!

বড়মামা অবাক হয়ে বললেন, এত কথা হল কেন? আমরা কোথা থেকে শুরু করেছিলুম...

শরৎবাবু বললেন, তা তো জানি না, তবে নিশ্চয় কোনওভাবে শুরু হয়েছিল। কথারও সব রুট থাকে।

জজসায়েব বললেন, "শুরু হয়েছিল প্যাড ছাপা হবে কি না— এই প্রশ্ন নিয়ে।

বড়মামা বললেন, হ্যাঁ, ঠিক। উত্তরটা কিন্তু পাইনি এখনও।

শরৎবাবু বললেন, পাবে কী করে? জঙ্গলে যেমন পথ হারিয়ে যায়, কথার জঙ্গলও তো সেইরকম। ওইজন্যে কথা বলার সময় একজন গাইড রাখতে হয়। যে ঠেলে ঠেলে বেলাইন থেকে লাইনে এনে দেবে। আমার মনে আছে, এক সভায় আমি রবীন্দ্রনাথের ওপর লেকচার দিচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ ঋতু, বর্ষার গান, বর্ষাকাল করতে করতে, আমার ছেলেবেলা, খিচুড়ি, শেষে খিচুড়ি কতরকমের আছে, খিচুড়ি কীভাবে রাঁধতে হয়, চাল কতটা, ডাল কতটা, ভুনি খিচুড়ি কাকে

বলে। আশ্চর্য, এই শ্রোতারা যদি একবারও মনে করিয়ে দিত, এটা পচিশে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, রান্নার ক্লাস নয়।

বড়মামা হেঁকে বললেন, প্যাড কি ছাপাতে হবে?

কীসের প্যাড?

আমাকে পুজো-কমিটির প্রেসিডেন্ট করেছে।

লাইফ প্রেসিডেন্ট?

না, এই তো, এইবার প্রথম করল।

তা হলে এক কাজ করো, ছাপিয়ে ফেলো, পরে পাশে একটা এক্স লিখে দিয়ো। এই বছরটা প্রেসিডেন্ট থাক, পরের বছর এক্স প্রেসিডেন্ট। ডাক্তারি তো চুটিয়ে করলে এতকাল, এইবার একটু সামাজিক হবার চেষ্টা করো। টাকাপয়সা দিয়েই হোক, যেভাবেই হোক, কিছু কিছু সঙ্ঘ, সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে যাও। তোমার তো আটটা কুকুর, আঠারোটা গোরু। তিন খাঁচা পাখি, তিরিশটা বেড়াল। এখন ওয়াইল্ড লাইফটা খুব পপুলার হয়েছে। তুমি ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফের সঙ্গে জড়িয়ে যাও। দেখবে, খুব ইজ্জতদার ব্যাপার।

জজসায়েব উঠে পড়লেন, আমি তা হলে চলি।

বড়মামা বললেন, চলবে? যাক সাইকেলটা তুমি তা হলে পেয়েই গেলে। ভালই হল।

আপনার কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। নিজের সাইকেলটা পাঠিয়ে দিয়ে আপনি আমাকে আরও লজ্জিত করতে চাইছিলেন। এ-সবই আমার স্ত্রীর কীর্তি। জানেন তো, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। আমার দেখুন কোনও ডাঁট নেই। আমার স্ত্রীর সাংঘাতিক ডাঁট। জজসায়েবের বউ বলে মাটিতে যেন পা পড়ে না।

ও তুমি ছেড়ে দাও। ও আমার মেয়ের মতো। আর সত্যিই তো, সাইকেলটা তো চুরিই হয়েছিল। সেই স্বদেশি আমলে এই বাড়িতে একবার ইংরেজ-পুলিশ এসেছিল, আর এই একবার দিশি-পুলিশ এল। আমাকে তো প্রায় হাতকড়া পরিয়েই ফেলেছিল। ভয়েই মরি। আর সত্যিই তো, সাইকেলটা তো চুরিই হয়েছিল।

মেজমামাকে নিয়ে জজসায়েব বেরিয়ে গেলেন। মুকুন্দ বললে, ব্যাপারটা কী হল?

বড়মামা বললেন, কী আবার হবে, নেহাত খাতির ছিল বলে চুরি করেও রেহাই পেয়ে গেলুম। পুলিশ চাকরি বাঁচাবার জন্যে কার একটা সাইকেল এনে আপনার সাইকেল বলে দিয়ে গেছে। সাইকেল তো আর মানুষ নয়। সব সাইকেলই একরকম দেখতে।

বড়দা, সেই কারণেই তো আমার ভুলটা হল।

যা, ব্যাটা খুব বেঁচে গেলি। চোরাইমাল আর বাড়িতে রাখিসনি, রাত হয়ে গেছে, গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে আয়।

হ্যাঁ, ফেলে দিয়ে আসবে। ওই তো আপনার জজের বাড়ি। দাওয়া থেকে মাল হাওয়া হয়ে গেল। জজসায়েবও চোরাই সাইকেল চাপবেন, আমরাও চোরাই সাইকেল চাপব। একেই বলে, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

শরৎবাবু চটাপট চটপট হাততালি দিয়ে বললেন, তোফা, তোফা, ঠিক জায়গায়, ঠিক কোটেশন। কোটেশন ছাড়া জীবন অচল। আচ্ছা, এখন আমার কথাটা হল, আমি কী করব, আমার তো কোনও কাজ নেই। কেউ কিছু খেতেও দিচ্ছে না। আমি কি তা হলে আবার শুয়ে পড়ব?

মাসিমা বললেন, আপনার এখনও খাওয়ার সময় হয়নি। হলে, আপনাকে খেতে দেব। এখন শুধু এককাপ চা খাবেন।

তোমরা দেখছি আমাকে না খাইয়ে মারবে। যাকগে, হারমোনিয়াম আছে?

হারমোনিয়াম কী করবেন?

বাঃ, এই সন্ধেবেলা তোমাদের একটু উচ্চাঙ্গ ভজন শোনানো আমার কর্তব্য। শুধু খেলুম দেলুম, মরে গেলুম এটা কোনও জীবন হল না রে ভাই। জীবনকে ক্ল্যাসিকাল সংগীতের মতো খেলাতে হয়। কটা বাজল এখন?

ওই তো আপনার সামনেই দেওয়াল-ঘড়ি।

সাড়ে ছয়। তার মানে এখন ইমন চলতে পারে। তারপর বেহাগ। বেহাগের পর খাওয়া। কেমন? ভদ্রলোকের চুক্তি।

মুকুন্দর ভীষণ গানবাজনার শখ। সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়াম নিয়ে চলে এল। মুকুন্দ আবার তবলা বাজায়। হারমোনিয়ামটি ডিভানে রেখে বলল, তবলাটা নিয়ে আসি?

তবলা? তুমি তবলা জানো? উত্তম, উত্তম। নিয়ে এসো। তবলা ছাড়া গান হয়?

আমি আবার গানও জানি। দক্ষিণ ভারতীয় মার্গ সংগীত।

সর্বনাশ! সে তো আবার খুব গুরুপাক। আমার যখন ম্যালেরিয়া হয়, তখন উত্তর ভারতীয় সব গান দক্ষিণ ভারতীয়ের মতো হয়ে যায়। তুমি ম্যালেরিয়া ছাড়াই ওই গান গাইতে পারো?

আমি শিখেছি যে!

শরৎবাবু একপাট হারমোনিয়াম বাজিয়েই গাক করে গান ধরলেন। বাঘ যেভাবে মানুষ ধরে, ঠিক সেইভাবে গানটা ধরলেন। মরা মানুষও চমকে উঠবে। একলাইন গেয়ে গান থামিয়ে বললেন, "সব সময় গলা ছেড়ে গান গাইবে। গলা একেবারে চাপবে না। আমার গুরু বলতেন, গলা দিয়ে গান গাইবে না, গান গাইবে পেট থেকে।"

কথা শেষ করেই তিনি আরও উঁচু পরদায় ধরলেন। গলা ফেটে ফুটিফাটা হয়ে গেল। সেদিকে গ্রাহ্য নেই। যাকে বলে সাংঘাতিক বেপরোয়া গাইয়ে। মুকুন্দ বড়াম বড়াম করে তবলা পেটাতে লাগল। গানের লাইনে গান চলেছে, তবলার লাইনে তবলা। কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। মুকুন্দ যত না বাজাচ্ছে, তার চেয়ে বেশি মাথা নাড়ছে। বড়মামা উঠে চলে গেছেন। মাসিমা বেরিয়ে গেলেন। পড়ে ছিলুম আমি। আমিও চুপিচুপি বেরিয়ে এলুম এক ফাঁকে। বাইরে থেকে মনে হচ্ছে ঘরের ভেতর গজ-কচ্ছপের লড়াই হচ্ছে যেন। সেই গান শুনে বড়মামার বাঘা বাঘা আটটা কুকুর লেজ গুটিয়ে বসে আছে জুজুবুড়ি হয়ে। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

রাতের পাট চুকে গেল। নীচের তলার আলোটালো সব নিভে গেছে। পুবের ঘরে শরৎবাবুর নাক ডাকছে গাক গাক করে। মুকুন্দ রোজ শোয়ার আগে স্নান করে। কুয়োতলায় ছড়ছড় করে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। মাসিমার একটা নিজস্ব ইজিচেয়ার আছে বারান্দায়। বিছানায় যাবার আগে সেই চেয়ারে বসে থাকেন আপনমনে। সেই সময় মাসিমা একেবারে অন্য মানুষ। এই সময় মাসিমার পাশে গিয়ে আমি বসি। মা-মরা ছেলে বলে মাসিমা আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। এই যে আমার মা নেই, আমার বাবা বিলেতে, আমি কিছু বুঝতে

পারি না। মাঝে মাঝে মায়ের কথা মনে পড়লে আমার চোখে জল এসে যায়। আসতেই পারে। সকলেরই কেমন মা আছে, আমার নেই। মা না থাকলে জমে? আমিও স্কুল থেকে ফিরি, আমার বন্ধুরাও ফেরে। তারা কেমন দরজার বাইরে থেকে 'মা', 'মা' বলে ডাকতে ডাকতে বাড়িতে ঢোকে। আমি আসি গুটিগুটি, চোরের মতো। মামার বাড়ি যতই ভাল হোক, নিজের বাড়ি আর মামার বাড়িতে একটু তফাত হবেই। মাসিমা আমাকে সাংঘাতিক ভালবাসলেও মাসিমাকে আমি ভয় পাই। ভীষণ রাগী মানুষ। অকারণে রাগেন না। কারণ থাকলে রেগে যান। তখন বড় বড় মা দুর্গার মতো চোখ দুটো জ্বলতে থাকে। ফরসা মুখ লাল হয়ে ওঠে। আমাকে ভালবাসেন বলে আমি কোনও অন্যায় করি না। জানি, অন্যায় করলেও আমার ওপর রাগ করবেন না। আমার হয়েছে মহা সমস্যা। আমার ইচ্ছে করে একটু অন্যায় করি, মায়ের হাতে একটু মার খাই। মারের পর একটু আদর খাই। শুধুই ভাল ছেলে হয়ে থাকা। একটু দুষ্টুমি যদি এখন না করি, কবে আর করব! বড় হয়ে?

মাসিমার পাশে বসে আছি। মাসিমার একটা হাত আমার মাথায়। আমি দেখেছি, মাসিমা আমার মাথায় হাত রাখলে, আমার সব বিপদ কেটে যায়। আমার জ্বর, পেট ব্যথা, মাথা ধরা, দাঁত কনকন— সব কমে যায়। স্কুলে পড়া পারি। তাই তো আমি মাসিমার পাশে এসে বসি। আরও বসি, মাসিমা ছেলেবেলার গল্প বলেন। মায়ের গল্প বলেন। মা কেমন সুন্দর গান গাইতেন। ফ্রক পরলে মাকে মেমেদের মতো দেখাত। মায়ের ভীষণ ভয় ছিল ভূত আর চোর-ডাকাতের। আবার সাপে ভীষণ সাহস ছিল। সবাই যখন ছুটছে, মা দাঁড়িয়ে আছেন। মাকে সবাই ভীষণ ভালবাসত। মা লেখাপড়ায় একেবারে সেরা ছিলেন।

প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম। মায়ের সঙ্গে নাকি কালীমন্দিরে ভোরবেলা মা-কালীর দেখা হয়েছিল। মা-কালী মায়ের মতোই একটি ছোট মেয়ের রূপ ধরে নাটমন্দিরে এক ঘণ্টা লুকোচুরি খেলেছিলেন। মা সেই লালপাড় শাড়ি-পরা, গাছকোমর বাঁধা মেয়েটিকে যতবার জিজ্ঞেস করেন, তোমার নামটি কী ভাই, ততবারই মেয়েটি হেসে হেসে পালায়। শেষে মা যখন খুব রাগ করে বললেন, যাও, নাম না বললে তোমার সঙ্গে আর খেলব না আমি। সেই থেকে তোমাকে আমি নাম ধরে ডাকতেই পারছি না। মেয়েটি তখন বললে, আমাকে তুমি এতক্ষণেও চিনতে পারলে না ভাই। আমার নাম, জগদম্বা। বলেই, মেয়েটি মা-কালীর মূর্তির মধ্যে ঢুকে গেল। সেই না দেখে আমার মা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত এসে মায়ের মুখে চরণামৃত দিয়ে জ্ঞান ফেরালেন। সব শুনে বললেন, তুমি মা ভাগ্যবতী। আমি সারাজীবন পুজো করে আজও দর্শন পেলাম না। পুরোহিত হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন। মায়ের গল্প সারা রাত হলে সারা রাত আমি জেগে জেগে শুনতে পারি। মাসিমার কাছে মায়ের অনেক অনেক গল্প আছে। এত গল্পও মা তৈরি করে রেখে গেছেন! আমার জন্যে মায়ের গল্প আছে, মা নেই।

মাসিমা সবে গল্প শুরু করতে যাচ্ছেন, এমন সময় বড়মামা বললেন, তোমরা একবার আমার ঘরে এসো, সাংঘাতিক একটা আলোচনা আছে।

মজেমামা, মাসিমা, আমি ঘরে ঢুকতেই বড়মামা সাবধানে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে। বড়মামা তো কোনওদিন এমন করেন না। কী হল আজ। বড়মামা মেঝেতে পুরু গালচেটা পাতলেন। ফিসফিসে গলায় বললেন, “তোমরা সব বসে পড়ো।”

মেজমামাও যেন বেশ ভয় পেয়ে গেছেন। আস্তে আস্তে বললেন, কী ব্যাপার বলো তো!

আমার ভাই, সমূহ বিপদ। বিপদ একা আমার নয়, আমাদের সকলের বিপদ।

মাসিমা বললেন, কী হয়েছে! কাউকে ইঞ্জেকশান দিতে গিয়ে মেরে ফেলেছ! জাল ওষুধের কেস নয় তো?

ওসব নয়, ওসব নয়। অন্য ঘটনা। ভয়ংকর একটা ঘটনা ঘটে গেছে। আমরা শেষ হয়ে গেলুম।

মেজমামা বললেন, আর আমাদের টেনশন না বাড়িয়ে দয়া করে বলে ফেলো। তোমার বিপদটা কী?

খুব কাছে সব সরে এসো। আরও কাছে।

বড়মামা এপাশে ওপাশে তাকালেন। জানালার দিকে তাকালেন। আমাকে বললেন, ঝট করে দেখে এসো তো, জানালার বাইরে কেউ আছে কি না!

ডিটেকটিভ বই আমি খুব পড়েছি। জয়ন্ত, সুন্দরবাবু, ব্যোমকেশ, কিরীটি রায়। পাকা গোয়েন্দার মতো তড়াক করে লাফিয়ে উঠে জানালার কাছে গেলুম। কেউ নেই। অন্ধকার আকাশ। গাছের মাথা দুলছে বাতাসে। দরজাটা টেনে দেখলুম। বন্ধই আছে। ফিরে এসে বসলুম। বড়মামা জোড়হাত হয়ে প্রণাম করলেন দেওয়ালে ঝোলানো ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সারদা মায়ের ছবিকে।

মেজমামা বললেন, উত্তেজনায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

আর ঠিক তখনই বড়মামা বললেন, আমি বিশ লক্ষ টাকা পেয়েছি। বলেই ভেউভেউ করে কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।

মেজমামা বললেন, যাঃ, তা কখনও হয়! বিশ লাখ টাকা কেউ লটারি পায়? তোমার কি সবই অদ্ভুত।

বড়মামা কান্ন-জড়ানো গলায় বললেন, কী করব ভাই, আমার বরাতটা চিরকালই একরকম রয়ে গেল। বিপদের পর বিপদ। বিপদের পর বিপদ। টিকিটটা আমাকে একজন জোর করে গছিয়ে গিয়েছিল। আমি নেব না কিছুতেই বলে কিনা... এই করেই আমি সংসার চালাই।

ব্যস, আর কী, তোমার অমনি দয়ার শরীর গলে গেল! নাও, এইবার ঠ্যালা সামলাও। তাও এক-আধ লাখ হয়! এ একেবারে বিশ লাখ! একে কী বলে জানো, খাচ্ছিল তাতি তাত বুনে, কাল হল তাঁতির গোরু কিনে।
আঃ, মেজমামা কোটেশনটা একেবারে ঘাটে ঘাটে লাগিয়েছেন। শরৎবাবু থাকলে তালি বাজাতেন।

বড়মামা বললেন, বিপদে পড়েছি ভাই। এখন আর তোরা আমাকে গালি দিসনি।

এই সর্বনাশ লটারিটা কোথাকার?

মেঘমল্লার বাম্পার।

নাও, এখন ডাক্তারি ফাক্তারি ছেড়ে ব্যাবসাদারদের মতো একটা গদি আর ছ'টা টেলিফোন নিয়ে বোসো। আর সারাদিন ভাও কেতনা, ভাও কেতনা করো। থার্ড ক্লাস, ন্যাস্টি, ভালগার, ব্লোটিং, রিকিং মানি। তোমার গা দিয়ে বিশ্রী

গন্ধ বেরোবে। তোমার মুখটা কোলাব্যাঙের মতো হয়ে যাবে। তোমার একটা ধামার মতো ভুড়ি হবে। তোমার সব চুল উঠে গিয়ে তেপান্তরের মাঠের মতো এতখানি একটা টাক বেরোবে।

পাছে টাকা জমে গিয়ে কালো টাকা হয়ে যায়, সেই ভেবে আমি দুহাতে উড়িয়ে দিই, উড়নচণ্ডের মতো। এ আমার কী সর্বনাশ হয়ে গেল!

তুমি তো এক্ষুনি দুম করে হার্টফেল করতে পারো। তখন কী হবে। তুমি তো চলে গেলে। তোমার আর কী। আমরা যে অনাথ হয়ে যাব। অনেক ভাগ্য করলে মানুষ এমন বড়দা পায়। তোমার বুকটা এখন কেমন করছে। ধড়ফড়, ব্যথা! আমি বরং একজন ডাক্তার ডাকি। আজ সারারাত তিনি এ-বাড়িতে থাকুন।

আমার এখনও কিন্তু সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না।

এখন ভয় পেয়ে আছ বলে কিছু হচ্ছে না। একটু পরেই তোমার আনন্দ হবে। তখন তোমার লাফ মারতে ইচ্ছে করবে। তারপর তোমার হার্টটা চমকে উঠেই থমকে যাবে।

মাসিমা বললেন, কত টাকা বললে?

কুড়ি লক্ষ।

কোনও মানে হয়! ছোটলোকের মতো এককাঁড়ি টাকা। তা তুমি টিকিটটা ছিড়ে ফেলে দাও না।

সে উপায় নেই। এর আগে তো আমি একটা দেড়লাখ টাকা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলুম।

তার মানে তুমি এর আগে আর একটা লটারি পেয়েছিলে?

গত বছরে।

ছিঃ ছিঃ, তোমার কী ভিখিরির বরাত।

সে টিকিট তো আমি ছিড়ে ফেলে দিয়েছিলুম। লটারির টাকা আমার পেছন পেছন তাড়া করলে আমি কী করতে পারি! এবারে আমার এজেন্টের কাছেই টিকিটটা ছিল।

সে কী বলছে?

খবরটা দেখে তার ছোট একটা হার্ট-অ্যাটাক মতো হয়ে গেছে। বেড রেস্টে ফেলে রেখে এসেছি। শোন, আমি ওভাবে মরব না, তবে আমি যা শুনেছি, তা আরও ভয়ানক ও ভয়ংকর। ভয়াল-ভয়ংকর এক অপরাধকাহিনি। খবরটা যখন ছড়াছড়ি হয়ে যাবে, তখন একদল ক্রিমিনাল কী করবে, আমাদের এই ছেলেটাকে তুলে নিয়ে চলে যাবে। নিয়ে গিয়ে রেখে দেবে গুম করে। সেখান থেকে চিঠি ছাড়বে, অমুক দিন অমুক জায়গায় তিরিশ লাখ টাকা নিয়ে হাজির থাকবে, হাতের কবজিতে সবুজ রঙের রুমাল জড়ানো একজন দাঁড়িয়ে থাকবে। তার সামনে দাঁড়ানোমাত্রই বলবে, জয় রাম। টাকাভরতি সুটকেসটা তার হাতে দেবে। তখনই কিন্তু ছেলেকে ফেরত পাচ্ছ না। ছেলেকে রাত বারোটার সময় বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে যাবে আমাদের ডেলেভারি ভ্যান। পুলিশের সাহায্য নেবার চেষ্টা কোরো না; তা হলে গোটা ছেলে আর ফিরবে না। তখন সেপারেট পার্সেলে ডাকযোগে তার পার্টস ফিরে আসবে। একবারে আসবে না, অনেকদিন ধরে একটু একটু করে আসবে। তার মানে আমাদের জন্যে ছেলেটার ভোগান্তি আর আমাদের বেনো ঢুকে ঘোরো জল বেরিয়ে যাওয়া...

বড়মামার কথায় আমার ভয় পাওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু আমাকে তো কেউ কোনওদিন কিডন্যাপ করেনি, তাই মনে হচ্ছিল রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনিতে

যা পড়েছি, একবার মিলিয়ে দেখার সুযোগ পেলে বেশ হয়। গভীর জঙ্গলে ছোট্ট একটা গুমটি ঘরে পুরে রাখবে। একপাল হিংস্র ডোবারম্যান কুকুর চারপাশে থাকবে পাহারায়। অনেক উঁচুতে একটা ঘুলঘুলি। সেই পথে অচেনা রোদ। অজানা একটি মেয়ে খাবার আনবে। বাইরে মাঝে মাঝে শোনা যাবে গুলিগোলার শব্দ। ঘরের ভেতর কাঠের পাটাতন। তার ওপর কুটকুটে কম্‌বল। একটা লোহার গেলাস। এক কুঁজো জল। বসেই আছি। বসেই আছি। কিছু খেতে চাইব না। দাড়িওলা ভীষণ চেহারার একটা লোক আমাকে মেরেধরে খাওয়াতে চাইবে। আমি তার হাতে কামড়ে দেব। সে আমাকে বলবে, ইবলিশের চ্যালা।

অনেক রাত অবধি মিটিং হল। বোঝা গেল বিষম বিপদ।

বড়মামা বললেন, আমার ব্যাঙ্কের এজেন্টকে নিয়ে গিয়ে টাকাটা এখানে আমার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে হবে। ভাবছি এজেন্ট ভদ্রলোককে একটা গাড়ি উপহার দেব। লাখখানেক খরচ হল। টাকাটা যেভাবেই হোক খরচ করতে হবে তো ধরো, বাড়িটাকে ভেঙে চুরমার করে আবার যদি তৈরি করাই তা হলেই তো সব টাকা খতম।

আর তুমিও খতম। পালে পালে সব আসবে, মেয়ের বিয়ে, ছানি অপারেশন, বারোয়ারি মনসাপুজো, ভোলেবাবা, দিতে না পারলেই বোমা, চাকু। শোনো, এ-খবর তুমি কিছুতেই চেপে রাখতে পারবে না। জানাজানি হবেই হবে। এ-ও এক ধরনের স্ক্যান্ডাল। তুমি ছেলেটাকে নিয়ে বেশ কিছুদিনের জন্যে আত্মগোপন করো।

মাসিমা বললেন, “যারা কিডন্যাপ করে, র‍্যানসাম আদায় করতে পারে, তাদের আগে থেকেই টাকাটা দিয়ে দিলে কেমন হয়! আমি শুনেছি অনুপার্জিত টাকা ব্যবহার করাটাও তো পাপ।

কে কিডন্যাপ করবে জানব কী করে? একটা দল? অনেক দল।

শোনো, তোমার গোঁপ-দাড়ি বেশ তাড়াতাড়ি বেরোয়। তুমি সাতদিন ছাতের ঘর ছেড়ে কোথাও বেরোবে না। ছেলেটাও তোমার সঙ্গে থাকবে। আমরা অ্যানাউন্স করে দিচ্ছি, তোমার ম্যাসিভ হার্ট-অ্যাটাক। নার্সিংহোমে ইন্টেনসিভ কেয়ারে। সাতদিনে তোমার চেহারা হয়ে যাবে ওমর শেখ-এর মতো। ছেলেটার তো আর দাড়ি-গোঁফ বেরোবে না, ওর চুল আর ভুরুটুরু সব আমরা কামিয়ে দেব। কেউ আর চিনতে পারবে না। তারপর রাত যখন গভীর হবে, একটা কালো গাড়ি এসে আমাদের খিড়কিতে দাঁড়াবে। তোমরা উঠবে। ন্যাশনাল হাইওয়ে থার্টিফোর ধরে সোজা কালচিনি ফরেস্টে। সেখানে আমার বন্ধু শৈবাল ফরেস্টঅফিসার। বিশাল বাংলো থাকে একা। তিনটে মাস গ্যাপ। তার মধ্যে থিতিয়ে যাবে ব্যাপারটা। তখন তুমি ওমর শেখের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে আমার তোমার চেম্বারে।

এ তো তোর সেই নেতাজির গ্রেট এস্কেপের মতো।

তিনি করেছিলেন মহাকারণে, তুমি করবে হীন কারণে। মহাপুরুষ আর পুরুষে এই তফাত ভাই।

আমি আর আমাদের ভাগনে না হয় অজ্ঞাত বনবাসে গেলুম; কিন্তু তোমাদের কী হবে। ধরো, কুসিকে যদি ধরে নিয়ে যায়!

মাসিমা বললেন, অত সহজ নয়। আমাকে ধরতে এলে তাকে আমি ধরে জালায় ভরে দেব। আমাকে তোমরা চেনো না।

মেজমামা বললেন, আমাকে ধরলে সেই ছেলেবেলায় অভ্যাসটা ঝালাই করে নেব। মারামারিতে আমার ভীষণ নাম ছিল।

বড়মামা বললেন, আমি ভাই একবার লুই পাস্তুর হব বলে গোঁফ-দাড়ি রাখার চেষ্টা করেছিলুম। জিনিসটা বেশ জমেও ছিল। কিন্তু ভাই, এমন কুটকুট করে। আমার দাড়িতে আবার ছারপোকা হয়েছিল। তারপর চুমুক দিয়ে তরল কিছু খেতে গেলে গোফের বিরক্তি। ঠোঁট ঠেকার আগে গোঁফ ডুবে গেল। তারপর সর্দি হলে নাক ঝাড়ার অসুবিধে। আমি বলি কী, বুড়োর মতো আমারও মাথা আর ভুরু কামিয়ে দাও।

ওই ভুলটা কোরো না বড়দা। তোমার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। বেরোতে সময় নেবে। বুড়োর চুল সাতদিনেই ঘন হয়ে উঠবে?

ভোর হয়ে এল। আমরা আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম যে-যার জায়গায়। আমি তো বড়মামার ঘরে শুই এপাশে ওপাশে খাট।

বড়মামা শুয়ে শুয়ে বললেন, কী সর্বনাশ হয়ে গেল! এখন প্রাণে বাঁচলে হয়।

আপনি টিকিটটা ছিড়ে ফেলে দিন না।

আরে, আমি তো মানুষ। লোভও তো আছে। কেবল মনে হচ্ছে, অতগুলো টাকা ছেড়ে দেব। যে কালীবাড়িতে দিদি মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছিল, সেই মন্দিরটার জীর্ণ দশা। খুব ইচ্ছে করে একেবারে ঢেলে সাজিয়ে দিই। আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে লক্ষ্মীদি, তার মেয়েটার বিয়ে দেবার পয়সা নেই। মনে

হচ্ছে, বিয়েটা বেশ ঘটা করে দিয়ে দিই। কত ছেলেমেয়ে পড়ার খরচ জোগাতে পারছে না। মনে হচ্ছে, যা হয় একটা কিছু করি। কিছুই করা যাবে না লোক জানাজানি হয়ে যাবার ভয়ে। এমন দেশ আমাদের, বিদেশ থেকে সব বিদেশি পাপ ধার করে আনছে। চুরি-ডাকাতি ছিল, কিডন্যাপিংটা ছিল না।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠল।

বড়মামা বললেন, কোনও এমার্জেন্সি কেস। ভদ্রভাবে বলে দাও, বড়মামার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। নার্সিংহোমে আছেন।

আঁ, কে বুলছেন?

আমি বুড়ো। আমার বড়মামার ভাগনে।

আঁ, লেকিন সুধাংশু মুকুর্জি কুথায়? লেটে আছেন কি, মজেসে। লোটারি মিলিয়েছেন না, আরে ব্বাপ বহত ভারী লোটারি।" আমি তাড়াতাড়ি ফোন নামিয়ে বড়মামার কাছে ছুটে এলুম। সর্বনাশ করেছে, এ তো গুন্ডার গলা। লোকটা এত জোরে গাঁক গাঁক করে কথা বলছে, নামিয়ে রাখলেও শোনা যাচ্ছে। ব্যাড়ব্যাড় করছে। হাঃ হাঃ করে হাসছে দৈত্যের মতো। ভয়ে আমার বুক টিপটিপ করছে।

বড়মামার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললুম, "সেই গুন্ডা। খবর পেয়ে গেছে। হাঃ হাঃ করে হাসছে, আর বলছে, "সুধাংশু মুকুর্জি, মজেসে লেটে আছে কি, বহত ভারী লোটারি মিলিয়েছে।"

বড়মামা টেলিফোনের দিকে গুটিগুটি এগিয়ে চললেন। লোকটা আমার সাড়া না পেয়ে 'হ্যাল্লো, হ্যাল্লো' করছে। বড়মামা ট্যাপ করে লাইনটা কেটে দিলেন। হাত কাঁপছে তার। চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। স্যান্ডো গেঞ্জি পরে আছেন। পিঠের খোলা অংশে আলো পড়েছে। ঘামে চকচক করছে। আমার গলা

শুকিয়ে গেছে। এমন বোকা, আমার মনে হচ্ছে, লোকটা টেলিফোনের ভেতর দিয়ে ঘরে চলে আসবে। ট্যাপ করায় লাইনটা কেটে গেল। বড়মামা রিসিভারটাকে টেলিফোন টেবিলেই শুইয়ে রাখলেন, যাতে আর কল না আসে।

আমরা দু'জনে ঢকঢ়ক করে জল খেলুম দু'গেলাস। বন্ধ দরজায় টোকা পড়ল। বড়মামা চমকে উঠে বললেন, কে, কে?

"দরজা খোলো।" ভারী গলা।

কে তুমি? বড়মামা মেজমামার গলা চিনতে পারছেন না ভয়ে।

কে মেজমামা? আমার গলারও জোর গেছে।

দরজাটা খোলো।

মেজমামা ঘরে ঢুকেই বললেন, আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। প্যারালাল লাইনে আমি সব শুনেছি। তুমি কতজনকে বলে বেড়িয়েছ শুনি তোমার স্বভাব তো আমি জানি। একটা কথাও পেটে রাখতে পারো না। কতজনকে বলেছ?

বেশি না, মাত্র তিনজন।

ব্যস, ওই তিনজন এখন তিন লক্ষ জন হয়ে গেছে। এই মুহুর্তে তোমাদের আমি পাচার করে দিতে চাই। আমরাও তোমাদের সঙ্গে যাব। মুকুন্দ আর মদনলাল বাড়ি সামলাবে। প্রয়োজনে ঝড়ু আসবে। ঝড়ু আর মদনলাল থাকলে ভয় নেই। প্রয়োজনে জান দিয়ে দেবে। গেট রেডি। গেট রেডি।

মেজমামা মাসিমাকে ডেকে তুললেন।

মাসিমা সমস্ত শুনে বললেন, নাঃ, যেতেই হবে। থাকলে বিপদে পড়ে যাব। কাল সকাল থেকেই আক্রমণ শুরু হয়ে যাবে। ব্যবসায়ীরা ছুটে আসবে কালো টাকা সাদা করতে। আমি শুনেছি, ওরা এইরকমই করে। তুমি বড়দা,

সর্বনাশ করে ফেলেছ। কেন তুমি তিনজনকে বলেছ। তিনজনের মধ্যে কে কে আছে?

ওই যে আমাকে মাসাজ করতে আসে, গোপাল হালুই।

তুমি গোপালকে বলেছ! বাঃ, উপযুক্ত লোককেই বলেছ। গোপাল মোটা মোটা ব্যাবসাদার আর শিল্পপতিকে মাসাজ করে। চুল কাটার সময় আর মাসাজের সময় জানোই তো যত কথা হয়। হয়ে গেছে। নিজের সর্বনাশ তো করলেই, আমাদেরও শেষ করলে। এ-বাড়িতে আর ফিরে আসা যাবে তো! ফিরে এসে কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে তো।

মাসিমা কথা শেষ করে যাবার জন্যে ঘুরে দাড়িয়েছেন কি দাঁড়াননি, সদরে গাড়ি থামার শব্দ। অনেকটা বাগান পেরিয়ে সদর। দক্ষিণের বাতাসে হর্নের শব্দ ভেসে এল। কে গেটটাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে। জোরে জোরে। সবাই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। বারান্দা থেকে অনেক দূরে হলেও, আমরা গেটটা দেখতে পাচ্ছি। বেশ বড় সাদা একটা গাড়ি। পাঞ্জাবিপরা বেশ মোটা মতো এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন।

মেজমামা বললেন, এই খেয়েছে। বড়দা, বড়দা, শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে ঘরে ঢুকে পড়ো। কুসি, তুই শিগগির যা। বোকা মুকুন্দটা সব গোলমাল করে দেবে। তুই শিগগির যা গিয়ে বল, মুকুন্দ যেন বলে, বড়বাবুর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। পাবলো ক্লিনিকে ইনটেনসিভ কেয়ারে আছে। বাড়ির সবাই সেইখানেই আছে। কোনওভাবেই যেন অন্য কথা না বলে।

মাসিমা তরতর করে নীচে নেমে গেলেন। আমরা গেরিলা সৈন্যের মতো বুকে হেঁটে ঘরে ঢুকে পড়লুম।

মেজমামা বললেন, ড্রেস আপ। ড্রেস আপ। বড়দা, তুমি বেশ ভাল করে সাজো তো। সবচেয়ে ভাল ট্রাউজার আর স্ট্রাইপড শার্ট পরো। সমস্ত চুল সামনে টেনে এনে তোমার চওড়া কপালটা ঢেকে ফেলো। কোমরে চওড়া বেল্ট লাগাও। আজ গগলসটা পরো। তোমার সেই ফরেন জিনিসটা।

নকশাল আমলে বড়মামা আত্মরক্ষার জন্যে রিভলভার রাখার লাইসেন্স পেয়েছিলেন। এই সময় খুব কাজে লেগে গেল যা হোক। আমাদের একটা ইন্টারকম আছে। মাসিমা ইন্টারকমে কথা বলছেন নীচে থেকে। মুকুন্দর কথা ভদ্রলোক বিশ্বাস করেননি। গাড়িতে বসে আছেন। মুকুন্দকে বলেছেন, "ব্যাবসাদার। আমি বুঝি মানুষ কোন চালে চলে! প্রয়োজন হলে সারাদিন গেট আটকে বসে থাকবেন।" মুকুন্দ সব ক'টা কুকুরকে বাগান ছেড়ে দিয়েছে। মাসিমা জিজ্ঞেস করছেন, "শরৎবাবুর কী হবে! তিনি তো এখনও ঘুমোচ্ছেন।"

মেজমামা বললেন, ঘুমোচ্ছেন, ঘুমোন। উঠে দেখবেন আমরা নেই।

আমাদের সাজ-পোশাক হয়ে গেল। নীচের স্টোররুমে বসে আমরা এক রাউন্ড চা খেয়ে নিলুম। করিডরের আয়নায় নিজেকে দেখে অবাক। চিনতেই পারছি না নিজেকে। কেমন যেন বকাটে বকাটে লাগছে। অন্য সময় এমন সাজলে, মেজমামাই আমাকে বলতেন, "যাও, এখানে কেন? সিনেমা হলে গিয়ে ব্ল্যাকে টিকিট বিক্রি করো।"

মুকুন্দকে একপাশে বসিয়ে পাখি-পড়ানোর মতো সব বোঝানো হল। আজই প্রথম শুনলুম, মুকুন্দ খুব ইন্টেলিজেন্ট ছেলে। মেজমামা বললেন, "আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। এরপর এমন কেউ এসে পড়বে, যার সঙ্গে দেখা করতেই হবে।"

আমরা আমাদের গাড়িটা কী করে বের করব যখন ভেবেই পাচ্ছি না, তখন মুকুন্দই বুদ্ধিটা বের করল। আমাদের গ্যারাজ থেকে গাড়িটা বের করে খিড়কির গেট দিয়ে পেছনের রাস্তায় পড়া যায়। আর ওই রাস্তায় একবার পড়তে পারলে আমাদের আর পায় কে! কিন্তু গাড়ি স্টার্ট করার শব্দ সামনের গেট পর্যন্ত চলে যাবে।

মুকুন্দ বললে, "আপনারা যেমন আছেন, সেইরকমই থাকুন, আমি গ্যারাজ থেকে গাড়িটা বের করে ঠেলে ঠেলে পেছনের রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছি। রাস্তায় নামিয়ে আমি পাখির ডাক ডাকব, তখনই আপনারা চলে আসবেন।

কী পাখি?

কোকিল।

মেজমামা বললেন, এটা বসন্ত কাল নয়। যা বলবে ভেবেচিন্তে বলবে।

তা হলে মুরগি। ওই ডাকটা ছেলেবেলা থেকেই আমি খুব অভ্যাস করেছি।

হ্যাঁ, মুরগি। এই তো আমার বুদ্ধিমান ছেলে!"

মুকুন্দ বেরিয়ে গেল। আমরা বসে আছি উৎকণ্ঠা নিয়ে। কখন সেই মুকুন্দ মুরগি ডাকবে। সবাই ঘড়ি দেখছেন। মাসিমা এত সুন্দর সেজেছেন; ঠিক একেবারে আমার মায়ের মতো দেখতে হয়েছেন। এইসময় আমার বাবা যদি বিলেত থেকে একবার আসতেন!

কোঁক-কোঁকোর-কোঁ। বিশাল এক রামপাখি তিনবার ডেকে উঠল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালুম সৈনিকের মতো। আমাদের তিনজনের হাতে তিনটে ব্যাগ। কৃষ্ণচূড়া, কাঁঠাল, আম আর জামরুল গাছের আড়াল দিয়ে,

ম্যাগনোলিয়া আর সবেদা গাছের তলা দিয়ে আমরা পেছনের কম্পাউন্ড পেরিয়ে রাস্তায়। কালো ঝকঝকে গাড়ির গায়ে চকচকে নিকেলের পাত। এই গাড়ি আমাদের কত দূরে নিয়ে যাবে! গাড়িটা বড়মামা সবে কিনেছেন। মেজমামা চালকের আসনে। মেজমামা টেরিফিক চালান। মেজমামার পাশে বড়মামা। আমরা পেছনে। বড়মামা একটা চামড়ার ব্যাগ মুকুন্দর হাতে দিয়ে বললেন, "টেন থাউজেন্ড।" বড়মামার নতুন মুখে পুরনো চোখের জল, "আমার আটটা কুকুর, আঠারোটা গোরু তিন খাঁচা পাখি, এই বাড়ি, মরিস মাইনার গাড়ি, সব, সব রইল, তুই একটু দেখিস, আমাদের সর্বস্ব।"

মেজমামা বললেন, "শক্ত হও, শক্ত হও। এটা ফ্যাঁস ফোঁস করার সময় নয়।" মুকুন্দকে বললেন, "মদন আসবে একটু পরে, মাস্তানকে খবর পাঠা। দুর্গের মতো বাড়িটাকে আগলাবি। এভরিথিং তোর হাতে। লক্ষ্মীদিকে থাকতে বলিস।"

জান কবুল করে দেব মেজদা। আচ্ছা, আপনারা কি ওই কারণেই চলে যাচ্ছেন?

কী কারণ?

বিশ লাখ।

তুই জানলি কী করে?

বড়দা যে বললেন, কাউকে বলিসনি মুকুন্দ। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি কাউকে বলব না। আমার মুখে সেলোটেপ।

মেজমামা বললেন, গুড বাই।

গাড়ি ছেড়ে দিল। তিন বাঁক ঘুরেই বড় রাস্তা। সাত কিলো দূরে এন এইচ থার্টি ফোর। আর আমাদের পায় কে! যাচ্ছি আমরা কালচিনি। একটু পরেই ভুটান। এত আনন্দ আমার কখনও হয়নি। সবাই মিলে একসঙ্গে, যেন টুরিস্ট পার্টি। মেজমামার ঠোটে সোনার ডগাওলা পাইপ। চারপাশে সদ্য ফোটা রোদের আমেজ।

হঠাৎ বড়মামা বললেন, কালাচিনিতে হাতি পাওয়া যাবে?

যাবে।

তা হলে, আমার অনেক দিনের ইচ্ছে, ছোট্ট একটা একটা হাতির বাচ্চা কিনব। সারা ঘরে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে।

মাসিমা বললেন, এই তো, বিশ দিনে বিশ ওড়াবার ঠিক রাস্তাই পেয়ে গেছ।

আমরা তো চলেছি! অজ্ঞাতবাসে। এদিকে যা হল, শরৎবাবু গেট খুলে বেরিয়ে এলেন হজমি-ভ্রমণে। সাদা গাড়ির মোটা চালক, 'আইয়ে আইয়ে' বলে খাতির করে তুলে নিলেন গাড়িতে। কবি হিসেবে এই খাতিরটুকুই চেয়ে এসেছেন সারাজীবন। তারপর! কে পাগল হল! একজন? না একসঙ্গে দু'জন! সে আর-এক কাহিনি!'